চৈতন্যচরিতামৃত প্রবেশিকা

সুশান্ত দত্ত

রমা প্রকাশনী

প্রকাশক :
শ্রীঅনুপরঞ্জন চক্রবর্তী
রমা প্রকাশনী
৫৯/৪/২ডি, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৫

প্রথম প্রকাশ : ১৮'ই সেপ্টেম্বর পুণ্যমহালয়া ১৯৫০

প্রচ্ছদশিল্পী :
রণেন মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক :
শ্রীমতী রাধারাণী ভদ্র
সুশীল প্রিন্টার্স
২, ঈশ্বর মিল বাই লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

উৎসর্গ

স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে সেণ্ট পল্‌স কলেজে ক্লাস নিতে আসতেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক স্বর্গত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ। আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের লেখা চৈতন্যচরিতামৃতের সমালোচনা গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি। তারপর মাস্টারমশাই-এর নিকট সান্নিধ্যে বহুদিন কেটেছে। অন্তরঙ্গ ছাত্র হয়ে তাঁর জীবনের বহু অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি। জ্ঞানানুশীলন ও দায়িত্বপালন ছিল জীবনের একমাত্র ব্রত। বড়ো ভাইয়ের সেবা করতে পারেন নি বলে অনুশোচনার অন্ত ছিল না। আপন জননীর প্রতি আজীবন তাঁর প্রণতি—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা স্মরণ করিযে দিতো। মাস্টারমশাইকে কেন্দ্র কবে চৈতন্যচরিতামৃতেব একটি পযার কতবার মনকে দোলা দিয়েছে—"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে / গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে॥" অধ্যাপক বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তো আর আমাদের মধ্যে নেই। তাই গ্রন্থ-রচনার ক্ষুদ্র পরিশ্রম ভক্তিনতচিত্তে তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করে বলতে ইচ্ছা করে—

"কতদিন সঙ্গীহীন কত রাত্রি দীপালোক হারা
তারি মাঝে অন্তরেতে পেয়েছি ইশারা।"



ভূমিকা

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যযুগের 'বাংলা সাহিত্যের অভ্রভেদী স্তম্ভস্বরূপ'। তবে চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে নানা প্রশ্নও পাঠকমনে জাগে,—প্রচুর আলোচনা সত্ত্বেও যে সব প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলে নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম ও মৃত্যুর কালনির্দেশ, চৈতন্যচরিতামৃত রচনার সময়, কৃষ্ণদাসের পাণ্ডিত্য ও চৈতন্যচরিতামৃতের ঐতিহাসিকতা, সর্বোপরি পুথির পাঠ নিয়ে অনেক বিতর্ক জমে উঠেছে। নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবের কাছে—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥

(নরোত্তম ঠাকুর : প্রার্থনা)

জন্মে জন্মে প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি।
তাঁহার তুলনা দিতে ত্রিভুবনে নাই॥
সর্বজ্ঞ সর্বতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ শিরোমণি।
শিলা দ্রবীভূত হয় তাঁর গুণ শুনি॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একত্র বর্ণন।
চৈতন্যচরিতামৃত গোসাঞির লিখন॥

(মুকুন্দ : সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়)

জয় কৃষ্ণদাস জয় কবিরাজ মহাশয়
সুকবি পণ্ডিত অগ্রগণ্য।
ভক্তিশাস্ত্র-সুনিপুণ অপার অসীম গুণ
সবে যারে করে ধন্য ধন্য।

(উদ্ধবদাস)

চৈতন্যচরিতামৃতের একদা সংস্কৃতে টীকা লিখেছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী;

একালে বাংলায় টীকা রচনা করেছেন বৈষ্ণবাচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ। চৈতন্য-চরিতামৃতকে রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন, 'ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্পুট। তাই এই অপূর্ব গ্রন্থখানি বৈষ্ণবের নিকট পরম আদরণীয়, বেদবৎ মান্য।'

কিন্তু বস্তুবাদী ঐতিহাসিকেরা ভক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চৈতন্যচরিতামৃত বিচারকালে নানা ধরনের অভিযোগ করেছেন। বিমানবিহারী মজুমদার কৃষ্ণদাস কবিরাজকে 'যুগপৎ উচ্চশ্রেণীর কবি ও দার্শনিক' বললেও সেই সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছেন—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজের অলৌকিক ঘটনা-বর্ণনার প্রতি ঝোঁক অত্যন্ত বেশি। তিনি পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ অনুসরণ করিতে করিতে সহসা তাহার আনুগত্য ছাড়িয়া অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন; যথা—আদিলীলায় আম্রভক্ষণ-লীলা, মধ্যলীলায় বৌদ্ধ পণ্ডিতের মাথা কাটা যাওয়া ও পুনরুজ্জীবন, কাশীমিশ্র ও প্রতাপরুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্তি বা ঐশ্বর্য দেখানো, রথাগ্রে কীর্তন করিতে করিতে এককালে সাতটি সম্প্রদায়ে উপস্থিতি, যে রথ মত্ত হস্তী টানিতে পারিত না তাহা শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক চালানো, আবির্ভাবরূপে শচীর অন্ন খাওয়া, কৃষ্ণনাম কহিয়া অমোঘের বিসূচিকা আরাম করা, বৃন্দাবনের পথে যাইতে যাইতে বাঘ-হরিণকে একসঙ্গে হরিনাম বলানো; অন্ত্যলীলায় ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্যের এক একখানি হাত দেড়গজ দীর্ঘ হওয়া, তিন দ্বারে কপাট লাগানো থাকা সত্ত্বেও প্রভুর বাহির হইয়া যাওয়া প্রভৃতি। দিগ্বিজয়ি-পরাভব, প্রকাশানন্দ-উদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতদের সহিত বিচার ও তাঁহাদিগকে পরাভব করার ঐতিহাসিক ভিত্তি নিতান্ত দুর্বল। এইগুলি ছাড়া আদি ও মধ্য লীলায় বর্ণিত ঘটনা-সমূহের মধ্যে অতি অল্প অংশই কবিরাজ গোস্বামীর মৌলিক অনুসন্ধানের ফল।

"তাঁহার বর্ণনায় অতিশয়োক্তির প্রতি আগ্রহও বেশি। শ্রীচৈতন্যকে তিনি নম্র ও বিনীতভাবে আঁকিতে যাইয়া কাহারও কাহারও মনে এমন ভাব জাগাইয়াছেন যেন রামানন্দের নিকটই শ্রীচৈতন্য রাধাতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন।"

সুশীলকুমার দে চৈতন্যচরিতামৃতকে শুধু তত্ত্বদর্শনের জন্য নয়, তথ্যসংগ্রহের জন্যও প্রশংসা করেছেন ('by far the most authoritative biography of Chaitanya') কিন্তু সেই সঙ্গে তত্ত্বপ্রতিপাদনের আগ্রহকে তথ্যবিকৃতির কারণ মনে করেছেন—

"It should, however, be remembered that it is no Charita, but a Charitamrita, written more from the devotional than from the historical point of view. Although, the work, like the other works on Chaitanya's life, was written within a century of his passing away, the Chaitanya myths and legends, originating from Navadvipa and gradually expanding, must

have completed the process of deification. Krishnadasa does not hesitate to accept them fully, but even elaborates and adds to them ; sometimes his devotional fancy goes to the extreme limits of credulity and the colours too thickly laid."

বলাবাহুল্য, বিমানবিহারী মজুমদাব ও সুশীলকুমার দে'ব অভিযোগেব প্রত্যুত্তবদানেব প্রযাসও দেখা গেছে একালে। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান তত সহজ নয়। চৈতন্যচরিতামৃত আধুনিক জীবনীসাহিত্যের নিদর্শন নয়, কাজেই অলৌকিকতা সেখানে থাকবে, অতিরঞ্জন সেখানে আপত্তিকব নয়, কাল্পনিক প্রসঙ্গ বা লোককথার সংযোজন সেখানে অপরিহার্য। তা সত্ত্বেও কৃষ্ণদাসের রচনায় যেটুকু তথ্যনিষ্ঠা দেখা যায়, তার জন্যই তিনি প্রশংসনীয়। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের যে কয়েকটি জীবনী রচিত হয়েছে, সবগুলির মধ্যেই তাঁর উপর দেবত্বের আরোপ ঘটেছে। সেক্ষেত্রে চৈতন্যের দেবত্বে-সংশয়ী পাঠক চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে আপত্তিবোধ করতে পারেন। কিন্তু পাঠকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস কাব্যবিচারেব একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। তাছাড়া চৈতন্যচরিতামৃতের অন্যতব কিছু আবেদনও স্বীকার্য, যেজন্য শুধু নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব নন, সাধারণ পাঠকও বইটি পড়ে থাকেন।

প্রথমত, বৈষ্ণব পদাবলী আস্বাদ করতে হলে বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শন নিয়ে অধিকাংশ গ্রন্থ লেখা হয়েছে সংস্কৃতে, এবং কোনো একটি গ্রন্থে সব কিছুর পরিচয় মেলে না। সেদিক থেকে মধুর-বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী-প্রবেশ চাতুরীসার হলো চৈতন্যচরিতামৃত। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে সহজ সরল বাংলায় সাবলীল ভঙ্গিতে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন আজও তা সাধারণ ছাত্র থেকে শুরু করে জিজ্ঞাসু পাঠকের প্রয়োজন মেটায়। সুশীলকুমার দে এই দিক থেকেই চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন—"Hitherto all learned theological treatises of Bengal Vaishnavism were written in Sanskrit, and the idea probably occurred to popularise the tenets in the vernacular in a standard work, so that they would not be confined to the learned few. The choice of Krishnadasa for this propagandist purpose was fully justified, and the work he produced at once took its place among the authoritative texts of the sect."

দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের বাঙালী সমাজের বিচ্ছিন্ন চিত্র আমরা মঙ্গলকাব্যের কবিদের রচনাতেই পাই, কিন্তু সেখানে ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বাস্তবতা রক্ষায় কবিদের সচেষ্ট দেখা যায় না। চৈতন্যদেবকে ভগবান রূপে দেখেও তাঁর

মানবপরিচয়ের কথা জীবনীকারেরা বিস্মৃত হন নি, তাই নিত্যলীলার সঙ্গে প্রকটলীলাও সমান প্রাধান্য পেয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পর্যটনের বিশদ বিবরণ পাই। চৈতন্যদেবের পার্ষদ এবং সমসাময়িক আরও বহুজনের কথাও কৃষ্ণদাস সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। অলৌকিক প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পরিহার করা সম্ভব না হলেও, সে সময়কার সাম্প্রদায়িক বিরোধ উত্তেজনার চিত্রাঙ্কনে কবির বাস্তবতাবোধের পরিচয় মেলে। আদি লীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদ থেকে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক—

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥
দ্বার দিঞা কীর্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসি আইসে না পায় প্রবেশে ॥
কীর্তন শুনি পাষণ্ডী জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসের দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল ॥
ভবানী পূজার সব সামগ্রী আনিল।
আসি শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইল ॥
কদলার পত্রোপরে থুইল ওড্র ফুল।
হরিদ্রা সিন্দুর রক্ত চন্দন তণ্ডুল ॥
মদ্য ভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত দেখিলা ॥
বড় বড় লোক সব আনিল বোলাঞা।
সভারে কহে শ্রীবাস হাসিঞা হাসিঞা ॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥
দেখি সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার।
হেন কর্ম ইহা কৈল কোন দুরাচার ॥
হাড়ি আনি সেই দ্রব্য দূর করাইল।
গঙ্গাজল গোময় দিঞা স্থান লেপাইল ॥
তিন দিন রহি সেই গোপাল চাপাল।
সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্ত ধার ॥
তাহাতে হইল কৃড়া কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জলএ অন্তর ॥

গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহএ পড়িঞা।
একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিঞা॥
গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা মো কুষ্ঠ ব্যাধিল হৈঞাছোঁ ব্যাকুল॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার॥
এত শুনি হৈলা প্রভু মহা ক্রোধ মন।
ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জন বচন॥
আরে পাপী ভক্ত দ্বেষী তোরে উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম ঐছে তোরে কুড়ারে খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসেরে করাইলি ভবানী পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥
এত বলি গেলা প্রভু করি গঙ্গা স্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে না যায় পরাণ॥

এই থেকেই চৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। তত্ত্বদর্শনে উদাসীন পাঠক নিতান্ত গল্পরস আস্বাদন এবং মানবচরিত্র প্রত্যক্ষ করার আগ্রহে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করে থাকেন। অল্প কয়েকটি রেখায় চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারতেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। শুধু মহাপ্রভুর চরিত্রাঙ্কনে নয়,অন্যান্য গৌণ চরিত্রগুলিও চৈতন্যজীবনীতে পূর্ণাবয়ব মূর্তি লাভ করেছে। 'মহাজীবন-কাব্য বা জীবন-মহাকাব্য' কি না জানি না, কিন্তু মহাকাব্যের মতোই চৈতন্য-চরিতামৃতে অসংখ্য মানুষের ভিড়—আর কাহিনীর মধ্যে কাহিনী। সব মিলিয়ে এক আকর্ষণীয় কথাকাব্য—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একমাত্র কাব্য, যা আজও আমাদের আকর্ষণ করে।

শ্রীসুশান্ত দত্ত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করলেও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও অভিনিবেশের বিষয়। দীর্ঘদিন শ্রীমান সুশান্ত বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃত-প্রবেশিকা গ্রন্থটি অবশ্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের জন্য লেখা নয়। সাধারণ পাঠক যাঁরা চৈতন্যজীবনী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব

তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে কিছু জানতে চান, তাঁরা বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও বইটি কাজে লাগবে। চৈতন্যচরিতামৃতে প্রবেশসাধ্য এই বইটি পড়ার পর আরও জানার জন্য পাঠকের কৌতূহল জাগবে, আর সেই কৌতূহল জাগানোর কাজে গ্রন্থটি সাহায্য করবে বলেই মনে হয়।

অলোক রায়

ঐতিহাসিক পটভূমি

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর দিব্যজীবনের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ভক্তের চোখে তিনি স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক পরিচয়ের কথা চরিতকারেরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারেন নি। বিশেষ দেশকালের পটভূমিতেই তাঁর আবির্ভাব। সামাজিক ও রাজনৈতিক এই পটভূমির পরিচয় আমরা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাই।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তখন বাংলা দেশে পাঠান শাসন চলছে। দিল্লীর সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ নিতান্ত অল্প হওয়ায় দিল্লীর সিংহাসনে কে বসলেন—তা নিয়ে সাধারণ বাঙালীর কোন চিন্তা ছিল না। বাংলা দেশে পাঠান শাসক ছিলেন হোসেন শাহ। ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হোসেন শাহের রাজত্বকাল। হোসেন শাহ সুশাসক হিসাবে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করলেও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে স্বাভাবিক করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। শাসকের অনুমোদন ক্রমেই কাজী নির্বাচিত হয়েছেন এবং কাজীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের বিরোধ কোন ব্যক্তিগত বিরোধ নয়। যদিও হোসেন শাহ মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলেছেন—"রাজা কহে শুন মোর মনে হেন লয়/সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহ নাহিক সংশয়।" (মধ্য/১) এবং তিনি আদেশ দিয়েছেন—"কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন/আপন ইচ্ছায় বলুন যাঁহা উহার মন॥" (মধ্য/১) কিন্তু ভক্তগণ হোসেন শাহকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি। রূপ-সনাতন তাই মহাপ্রভুকে অনুরোধ করেন—"ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ/যদ্যপি তোমার ভক্তি করে গৌড়রাজ।" (মধ্য/১) যবন হরিদাসের সঙ্গেও কাজীর বিরোধ চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। হোসেন শাহ এইসব অত্যাচার সম্বন্ধে কতটা অবগত ছিলেন—তা জানা যায় না।

হোসেন শাহের দুই অমাত্য রূপ ও সনাতন শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হোসেন শাহ যখন উড়িষ্যা আক্রমণ করতে উদ্যত হন তখন সনাতনকে সঙ্গে যেতে বলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—"হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে/সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে।" (মধ্য/১৯) কিন্তু হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসকর্ম সনাতন দেখতে প্রস্তুত নন। তাই তিনি উড়িষ্যা যেতে অসম্মতি জানান। ফলে সনাতনকে রাজা কারারুদ্ধ করেন। সনাতন কারাগার থেকে পলায়ন করলেন এবং গৌড়ের রাজ্যসীমা পার হওয়ার সময়—"তবে গোসাঞির সঙ্গে ভুঞা চারি পাইক

দিল/রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্বত পার কৈল।" (মধ্য/২০) হোসেন শাহ উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধকালে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। আবার প্রতাপরুদ্রও গৌড় পর্যন্ত তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, এমন কথা সেকালের ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় বাংলার ছবি আঁকছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ—"মদ্যপ যবনরাজের আগে অধিকার/তার ভয়ে কেহো পথে নারে চলিবার/পিচ্ছলদা পর্যন্ত সব তাহ অধিকার/তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার।" (মধ্য/১৬) উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর প্রতি অশেষ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। হোসেন শাহের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ এবং সন্ধি এর পরবর্তীকালের ঘটনা। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রতাপরুদ্র বলতেন—"এলক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন/কোটি চিন্তামণিলাভ নহে তার সম॥" (অন্ত্য/৯)

প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের শক্তিশালী রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের একাধিক যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পরে কৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রতাপ-রুদ্রের সন্ধি স্থাপিত হয়। কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে কৃষ্ণদেব সম্বন্ধে জনৈক অমাত্য বলেছেন যে মহাপ্রভুর অলৌকিক চরিতকথা জেনে তিনি ভবদহনজ্বালা বিস্মৃত হয়েছেন।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে প্রথম মোগল সম্রাট বাবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহাপ্রভুর তখন বয়স চল্লিশ বৎসরের কাছাকাছি। সে সময়ে তিনি নীলাচলে অবস্থান করছেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বৎসর মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটে। উত্তরভারতে তখন মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা দেশে বা উড়িষ্যায় তখনও তার প্রভাব সেভাবে পরিলক্ষিত হয় নি।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের উল্লেখ দেখা যায় না। তবে মহাপ্রভু তাঁর জীবনের একটা বড়ো অংশ উত্তর ও দক্ষিণভারত পরিভ্রমণে কাটিয়েছেন। কোন সন্দেহ নেই - এই ভ্রমণকালে শুধু বিভিন্ন স্থানের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে নি—শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তার তেমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ভারতের 'সাতানি' সম্প্রদায়ের দাস গায়কেরা নগর সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির আদর্শ প্রচার করেন। মহানদীর উত্তরভাগে 'জুয়াং' সম্প্রদায়ের কাছে মহাপ্রভু বোধ হয় একদা ফল ভিক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাই তাঁরা একটি পাত্রে কিছু ফল সাজিয়ে মহাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করে আসেন। এই সকল ঘটনার বিশদ বিবরণ বা তাৎপর্য এই গ্রন্থে তেমন পাওয়া যায় না।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে

সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—"মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড/ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥" (মধ্য/১৭) প্রেমভক্তিতে মহাপ্রভু তাদের আপনজন করে নিয়েছিলেন। এইভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবরণের মধ্য দিয়ে আমরা মধ্যযুগের ভারতবর্ষের এক জীবন্ত চিত্র চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

সমাজ পটভূমি

ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু নিজের জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে এবং ধর্ম-সাধনায় তত্ত্ব-উপদেশের মধ্য দিয়ে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন তা এক হিসাবে অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর। মধ্যযুগের সূচনা থেকেই জাতীয় জীবনে সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ রাজা না হলেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে অনুভব করা গেছে। বিভিন্ন অনুশাসনের চাপে সমাজ মৃতপ্রায়। এই অবস্থায় মহাপ্রভুর আবির্ভাব তথা চৈতন্যধর্মের প্রসার বাঙালী সমাজজীবনে শুধু পরিবর্তন এনেছে তাই নয়—প্রায় এক ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। নৈয়ায়িক কূটতর্ক বা স্মার্ত পণ্ডিতদের বিধিবিধানের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাধারণ মানুষের চিত্ত ছিল উন্মুখ। ফলে মুষ্টিমেয় রক্ষণশীল অথবা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে প্রতিকূলতা পেলেও সাধারণভাবে মহাপ্রভু খুব সহজেই মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছিলেন। তখন থেকেই তন্ত্র মন্ত্র অভিচারের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় এবং চৈতন্যদেবের রুদ্ধদ্বার কক্ষে ভক্তদের কাছে কীর্তন অনেকেরই মনে হয়েছিল বুঝি তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের নিদর্শন। আসলে অবিশ্বাসীর অভাব কোনকালেই হয় না। ফলে শ্রীবাসের গৃহে গোপনে বৈষ্ণবদের মদ্যপান চলেছে—এমন ইঙ্গিতও করেছেন সাম্প্রদায়িক মানুষেরা। আসলে মঙ্গলচণ্ডী বিষহরির জাগরণ পালা এবং তার সঙ্গে নৃত্যগীত বাদ্যের সংযোগ থেকেই তাঁদের লৌকিক ধর্মসাধনা সম্বন্ধে সংকীর্ণ ধারণা গড়ে ওঠে। অন্যদিকে মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে সকল বর্ণের মানুষের ভক্তি-সাধনার অধিকার তথা অন্ত্যজকেও বুকে জড়িয়ে ধরাকে অনেকে সুদৃষ্টিতে দেখেন নি। তাঁদের মনে হয়েছে নীচজাতি এইভাবে ধর্মসাধনায় অধিকার পেলে নবদ্বীপ পাপে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মহাপ্রভু অব্যর্থ ভাষায় বললেন—"নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।" (অন্ত্য/৪) এইভাবে হয়তো সেকালের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে চৈতন্যধর্মের বিরোধ বেধেছে। তন্ত্রাচারকে কিংবা নাথধর্মের গুহ্য সাধনকে বৈষ্ণবেরা যেমন গ্রহণ করতে পারেন নি, তেমনি সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের বিকৃত রূপটিও তাঁদের কাছে পরিত্যাজ্য বিবেচিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্য

ভ্রমণকালে বৌদ্ধাচার্য, মহাপ্রভুর যুক্তিতর্কে পরাজয় স্বীকার করে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—এই বর্ণনার সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য।

সে সময়ে বাংলা দেশে মুসলমান শাসক। সেদিক থেকে ইসলামধর্ম ছিল রাজধর্ম। মহাপ্রভু ধর্মীয় বিতর্কে সাধারণতঃ যোগ দেন নি। কিন্তু তিনি যখন দেখেছেন সমাজের নীচ অন্ত্যজ শ্রেণী মুসলমান হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি প্রেমের ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে সেই প্রবণতাকে এক হিসাবে রোধ করেছেন। হিন্দু ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। একদিকে বাইরের আঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা অন্যদিকে মৃতপ্রায় অবসন্ন জাতির মধ্যে প্রাণসঞ্চার—এই উভয় ক্ষেত্রেই মহাপ্রভুর বিশিষ্ট ভূমিকা স্মরণীয়।

মহাপ্রভু কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। তিনি নিজে তাঁর পূত পবিত্র চরিত্রের সাহায্যে আমাদের সামনে একটি আদর্শ উপস্থিত করেছেন। যার ফলে সহস্র নীতি উপদেশ দানের কাজ হয়েছে খুব সহজে এবং দ্রুত গতিতে। ব্রাহ্মণ হয়েও বর্ণভেদ প্রথায় তিনি বিশ্বাস করেন নি। "কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।" এখানে নৈতিক আদর্শের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

ভট্টমারী তথা বামাচারী সন্ন্যাসী যখন মহাপ্রভুর সঙ্গী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে—"স্ত্রীধন দেখাইয়া তার লোভ জন্মাইল"—তখন মহাপ্রভু রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন এবং বিপথগামী সঙ্গীকে—"কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন।" মহাপ্রভু মানুষের লোভ ও আসক্তি, অন্ধবিশ্বাস ও সংকীর্ণতা, ভেদবুদ্ধি ও আত্মচিন্তাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি সেই সঙ্গে কখনও সকৌতুকে, কখনও তীক্ষ্ণ ভাষায়, কখনও সরোষে তাদের ভ্রান্তি অপনোদন করেছেন। বৃন্দাবন ভ্রমণকালে একদিন—"লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে/কালিয় শিরে নৃত্য করে ফণারত্ন জ্বলে ॥" (মধ্য/১৮) মহাপ্রভু শুধু এই জাতীয় অলৌকিক ঘটনা অস্বীকার করেন নি—তিনি তা নিয়ে পরিহাস করেছেন। পরদিন জানা গেল রাত্রিতে যমুনার জলে নৌকায় আলো জ্বেলে মাছ ধরা হচ্ছিল।

সনাতনের মতো বিজ্ঞ পার্ষদও যখন মনে করেছেন দেহত্যাগের মধ্যেই বুঝি ভগবৎলাভ—তখন মহাপ্রভু প্রীতিপূর্ণ ভাষায় বুঝিয়ে বলেন—"সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে/কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥" (অন্ত্য/৪)

সমাজজীবনে বিপ্লব ঘটালেও মহাপ্রভু সম্ভবতঃ সামাজিক অস্থিতি কাম্য বিবেচনা করতেন না। সমাজের সুস্থ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ও রক্ষণে লোকসাধারণের ভূমিকা তিনি জানতেন। ফলে কখনও প্রতিবাদী মনোভঙ্গির পরিচয় দিলেও তাঁর মুখেই শোনা যাবে—"আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে ॥" (মধ্য/৭) এই সাধারণ মানুষের সঙ্গে অন্তরের যোগ ঘটেছিল বলেই—মহাপ্রভু শুধু বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের গুরুরূপে পূজিত হন নি—সাধারণভাবে সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন লাভ করেছেন।

কবিজীবনী

মোরে আজ্ঞা দিল সভে করুণা করিঞা।
তাঁসভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইঞা॥ (আদি/৮)

চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিশদ জীবনী আমাদের জানা নেই। তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোধান দিবস নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলেছে। তবে চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে আমরা তাঁর জীবনের কিছু ঘটনাবলী জানতে পারি। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে 'ঝামটপুর' গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর নিত্যানন্দভক্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ লাভ করে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। "জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম/যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম॥" (আদি/৫) কবিরাজ গোস্বামীর জীবনের অধিকাংশ ভাগ বৃন্দাবনে অতিবাহিত হয়। বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক পণ্ডিত শ্রীহরিদাস তাঁকে গ্রন্থপ্রণয়নে আদেশ দেন। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ ঘরণী জাহ্নবীমাতা এবং নিত্যানন্দতনয় বীরচন্দ্র গোস্বামীর সাক্ষাৎলাভ করেন। ছয় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সেবা করার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। রঘুনাথ দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ শেষ বয়সে রাধাকুণ্ডের কাছে বাস করতেন। "রঘুনাথ দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি/তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥" (অন্ত/১৪) শুধু রঘুনাথ দাস নন—বৃন্দাবনের অন্যান্য প্রধান সাধক ভক্ত ও পণ্ডিতদের সান্নিধ্যও তিনি লাভ করেন। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রী গোপাল ভট্ট—প্রভৃতির সঙ্গ উপদেশ এবং সাহায্যলাভের ফলে পরিণত বয়সে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। কাব্যের মধ্যে একাধিক স্থানে তিনি জানিয়েছেন—"আমি বৃদ্ধ জরাতুর/লিখিতে কাঁপয়ে কর/মনে কিছু স্মরণ না হয়/না দেখিয়ে নয়নে/না শুনিয়ে শ্রবণে/তভু লিখি এ বড় বিস্ময়॥" (মধ্য/২) অথবা—"ইহার মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে।"

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে শুধু তথ্যনির্ভরতার জন্য বিশিষ্ট স্থান লাভ করেনি, এখানে চরিকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান তত্ত্বগুলি সুনিপুণভাবে পরিবেশন করেছেন। এই কাজে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ

এবং জীবগোস্বামীর কাছে তিনি অশেষ কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেছেন—"শ্রীরূপ সনাতন/ রঘুনাথ জীব চরণ/শিরে ধরি যার করি আশ/কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত/ কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥" (মধ্য/২৫)

মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনের কাহিনী চৈতন্যচরিতামৃতে স্থান পেলেও সেখানে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলাই অধিকতর গুরুত্বলাভ করেছে। অন্ত্যলীলার সবিস্তারে রচনার দুটি কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে অন্ত্যলীলার কাহিনী শোনার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ "আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ/শেষ লীলা শুনিতে সভার হৈল মন।" (আদি/৮) তবে বৃদ্ধবয়সে কাব্যটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল। মহাপ্রভুর কৃপায় অবশেষে কাব্য সমাপ্ত হলো। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যচরিতামৃত তথ্যনির্ভরতায়, তত্ত্বমূল্যে এবং তার কাব্যরূপায়ণে এক অসামান্য স্থান অধিকার করে আছে।

'প্রেমবিলাস', 'ভক্তিরত্নাকর', 'কর্ণানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। চৈতন্যচরিতামৃত লেখা শেষ হলে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তা অনুমোদন করেন। এর পর বাংলা দেশে প্রচারের জন্য চৈতন্যচরিতামৃত প্রেরিত হলে বনবিষ্ণুপুরের ডাকাত রাজা হাম্বীরের অনুচরেরা মহামূল্যবান ঐশ্বর্য মনে করে—পেটিকা অপহরণ করে। পুঁথি লুণ্ঠনের সংবাদ বৃন্দাবনে পৌছালে মর্মাহত কৃষ্ণদাস সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক যাথার্থ্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের রচনাকালও বিতর্কিত। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অনেকে মনে করেন কাব্যটি ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছে। তবে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না।

'চৈতন্য গোসাঞির লীলা অমৃতের ধার'

চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ। এদিক থেকে কাব্যটির আবেদন সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু সাধারণ পাঠক, যিনি বৈষ্ণবধর্মের গভীরে প্রবেশ করেন নি বা প্রবেশ করতে ইচ্ছুক নন—তিনিও চৈতন্যচরিতামৃত আস্বাদনে সক্ষম। সেখানে এই গ্রন্থ ধর্ম দর্শনের জন্য আকর্ষণীয় নয়। মধ্যযুগে দেবমাহাত্ম্যের কাব্য অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে আমরা মানবমাহাত্ম্যের দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। এই গ্রন্থে ভক্তের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যদেব দেবতা বলে পরিগণিত হলেও তাঁর মানব রূপটি অগোচরে থাকে নি।

মহাপ্রভুকে যদি আমরা একজন অসামান্য লোকনায়ক—মানবপ্রেমিকরূপে গ্রহণ করি—তাহলে তাঁর আচার আচরণ সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্য ধারণ করে। সেখানে দেখি তিনি মধ্যযুগে অবস্থান করেও—শুধু বর্ণভেদ প্রথার উর্ধ্বে যেতে সক্ষম হন নি—সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিহারের পথও দেখিয়েছেন। আধুনিক-কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রদায়গত বিভেদ যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন মধ্যযুগে কিভাবে চৈতন্যদেব ঐক্যবদ্ধ সমাজরচনার কথা ভেবেছেন—তার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। সম্ভবত তিনি যে ঐক্যবন্ধনের কথা ভেবেছিলেন তা বাইরে থেকে বৈষ্ণবধর্মের বন্ধন বলে মনে হলেও আসলে তা মানবিক প্রেমের বন্ধন। তা না হলে পূর্বভারত থেকে উত্তরভারত এবং উত্তরভারত থেকে দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের ও সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি একত্রিত ক'রতে পারতেন না।

চৈতন্যসংস্কৃতি

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই বুঝি মহাপ্রভুর জীবনের একমাত্র কর্ম। কিন্তু বাংলা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা পর্যালোচনা ক'রে দেখলে তার প্রভাব অনেক ব্যাপক ও দূরবিস্তারী বলে জানতে পারি। জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। শুধু তাঁর ভক্তি-সাধনা নয়—তাঁর জীবন-চর্যা বাঙালীকে প্রগাঢ়ভাবে অভিভূত করে। চৈতন্যদেব কোন ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন নি। কিন্তু তাঁর জীবনে ও আচরণে অনেক ধর্মগ্রন্থের সারভূত বস্তুটি প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যযুগের নির্বীর্য অবসন্ন জাতীয় জীবনে 'প্রেমভক্তি' এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু পদাবলী সাহিত্যে নয়, সাহিত্যের অন্যান্য ধারাতেও কমবেশি পরিমাণে তাঁর প্রভাব অনুভূত হয়েছে। আর সাহিত্যকে যদি জীবনভিত্তিক মনে করি—তাহলে বুঝতে পারি, সেই প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনের কত গভীর মর্মমূলে প্রবেশ করেছিল। কোন দেশের জীবনধারাকে এই ভাবে কোন সাধক বা ভক্ত এতখানি প্রভাবিত করতে পারেন নি। ফলে চৈতন্যদেব যেন এক আদর্শরূপে আমাদের মধ্যে কাজ করেছেন—যে আদর্শকে আমরা ব্যাপক অর্থে 'চৈতন্যসংস্কৃতি' নামে অভিহিত করতে পারি। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের সমাজ ও সাহিত্যের সঙ্গে চৈতন্যোত্তর যুগের সমাজ ও সাহিত্যের তুলনা করলেই আমরা চৈতন্যসংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো। চৈতন্যসংস্কৃতি আমাদের জাতীয় জীবনে সেই অনুপম ভাবপ্রেরণা, যা মধ্যযুগের বাংলা দেশে এক অভূতপূর্ব নব জাগরণের সূচনা করে।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগেও বৈষ্ণবধর্ম বহুতর ভক্ত মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু সাধারণভাবে দুর্বল বা অসহায় মানুষ সবল ও শক্তিমান দেব-দেবীর আশ্রয় খুঁজেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে লৌকিক দেবদেবী যেভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে থাকে, তার পিছনে ভীত সন্ত্রস্ত পরাশ্রয়ী মনোভাব লক্ষ্য করা যাবে। আসলে সমাজ ও রাষ্ট্রে যখন বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা প্রবল হয়ে ওঠে, তখন মানুষ লৌকিক প্রয়োজনের কথা ভেবেই লৌকিক দেবদেবীর আশ্রয় নেয়। ষোড়শ শতাব্দীতে সমাজজীবনে কিছুটা স্থিতি এলেও তখনও সেই অসহায়তাবোধ সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নি। সমাজশক্তি এবং রাষ্ট্রশক্তি নানাভাবে দুর্বলের উপর অত্যাচার করে চলেছে। সহিংস প্রতিরোধের চেষ্টা কোথাও হয় নি তা নয়—কিন্তু সাধারণভাবে প্রবলতর শক্তির কাছে দুর্বলতর শক্তির এ ক্ষেত্রে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আসলে নৈতিক শক্তিই মানুষকে যথার্থ বলশালী করে তোলে। মহাপ্রভু আমাদের জাতীয় জীবনে সেই নৈতিক শক্তি সঞ্চার করেছেন। অহিংস অসহযোগ তথা সংঘবদ্ধ আদর্শচালিত মানুষের কাছে পরম অত্যাচারীও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বৈষ্ণবধর্ম তাই দুর্বলের ধর্ম নয়—প্রেমধর্মের মধ্যেও এমন একধরনের সবলতা আছে—যা অপ্রেমকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম।

মহাপ্রভু প্রবর্তিত কীর্তন বা নামগান দুর্বলের প্রাণেও অভূতপূর্ব শক্তির সঞ্চার করেছে। বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে নাম-কীর্তনের এই প্রভাব মহাপ্রভুরই দান। শুধু কাজীর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নয়—যে কোন অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে নামকীর্তনের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। মহাপ্রভু প্রথমে একদল ভক্তকে অনুপ্রাণিত করেছেন। পরে সেই ভক্তমণ্ডলী বৃহত্তর জনসমষ্টির মধ্যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে আচরণবিধির উপর মহাপ্রভু অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি জানতেন 'আপনি আচরি ধর্ম'—অন্যকে শিক্ষাদান সম্ভব। তাই ব্যক্তিজীবনে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত হওয়ার প্রয়োজন। প্রচলিত সন্ন্যাসজীবন বা বৈরাগ্যসাধনের মধ্যেও চরিত্রগঠনের উপাদান আছে। কিন্তু তার সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যোগসাধন ঘটলে তবেই সন্ন্যাসী মহাপুরুষের চারিত্রিক প্রভাব সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মহাপ্রভু যে ধর্ম প্রচার করলেন তার ভিতরে রয়েছে কামনা বাসনাহীন এক বলিষ্ঠ জীবনবোধ, যা শুধু দুর্নীতির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে নি—মহত্তর এক আদর্শবোধের দিকে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্‌॥

'মোর বাণী শিষ্যা তারে বহুত নাচাই'

অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইলা নাচি করিল বিশ্রামে'। (অন্ত্য/২০)

মধ্যযুগে বৈষ্ণবসাহিত্য সৃষ্টিতে অসামান্য কয়েকজন কবি-শিল্পীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করা গেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই ধরনের কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। নিছক কাব্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যেও চৈতন্যচরিতামৃত লেখা হয় নি। কিন্তু অন্তরের গভীর উপলব্ধি যখন ভাষারূপ লাভ করে তখন শিক্ষিত সংবেদনশীল লেখকের রচনা কমবেশি পরিমাণে সাহিত্য লক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব ভক্তের কাছে চৈতন্যচরিতামৃত শুধু ধর্মগ্রন্থ বলে পরিগণিত হয় নি—বৈষ্ণব সাহিত্যে সম্ভবত একমাত্র মহাকাব্য বলে বিবেচিত হয়েছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরিত্রমাহাত্ম্য এমনই অসামান্য যে নিঃসন্দেহে তাঁকে নিয়ে মহাকাব্য রচনা সম্ভব। অনেকেরই মনে হয়েছে মহাকাব্য যেমন করে সমস্ত যুগচিন্তা ও যুগভাবনাকে আত্মসাৎ করে গড়ে ওঠে—চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে তেমনি শ্রীচৈতন্য এবং সেইসঙ্গে গৌড়ীয় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক যুগচিত্তের সকল ভক্তি ও অনুরাগ, সকল স্মরণ মনন, সর্ববিধ প্রজ্ঞা ও মনীষা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। যদিও চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ,—কিন্তু এ যেন কোন ব্যক্তির সৃষ্টি নয়—চৈতন্য পরিকর তথা যাবতীয় বৈষ্ণব ভক্তের আকাঙ্ক্ষা কাব্যটির মধ্যে বাণীরূপ লাভ করেছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যে কোথাও কোথাও অর্বাচীন পুরাণগুলির ধারা-অনুসরণ ঘটলেও চৈতন্যচরিতামৃতকে পৌরাণিক কাব্য বলা যায় না। রামায়ণ যেমন নরোত্তম রামচন্দ্রের কাহিনী, চৈতন্যচরিতামৃত তেমনি ভগবানের নরলীলার এক অসামান্য বিবরণ। মানব মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই যেন কাব্যটি রচিত হয়েছে। এই মানব-রসই চৈতন্যচরিতামৃতের মতো তথ্য ও তত্ত্ববহুল রচনাকে অনেক পরিমাণে কাব্যলক্ষণাক্রান্ত করে তুলেছে।

সাধারণভাবে চরিতকাব্যে বহু বিচিত্র তথ্যের সমাবেশ ঘটে। শুষ্ক তথ্যের মধ্য থেকে কাব্যরস নিষ্কাশন সহজ নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মধ্যে শুধু যে এক রসিক চিত্তই লুকিয়েছিল তাই নয়—সমুন্নত কল্পনাশক্তিরও তিনি অধিকারী ছিলেন। তাই তথ্যসংগ্রহ ও সন্নিবেশের ব্যাপারে ঐতিহাসিকের মতো সতর্ক হলেও—তার পরিবেশনে শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। স্থপতি যেমন ইট কাঠ

পাথরের সাহায্যে অপরূপ দেবদেউল নির্মাণ করেন—কৃষ্ণদাস কবিরাজও তেমনি বিভিন্ন উৎস থেকে আহৃত তথ্যের সাহায্যে আরাধ্যদেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র রচনা করেছেন। কৃষ্ণদাসের রচনার মধ্যে তাই অনেকে শুধু চরিত রচনার প্রয়াস দেখেন নি—তার মধ্যে দেখেছেন অমৃত পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষা।

চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাসের যে কবিপ্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে—তার মধ্যে তিনটি লক্ষণ আমাদের বিশেষভাবে চোখে পড়ে। প্রথমতঃ কাহিনীবিন্যাস কৌশল, দ্বিতীয়তঃ চরিত্রাঙ্কন নৈপুণ্য এবং তৃতীয়তঃ ভাষাচিত্র রচনায় দক্ষতা।

কৃষ্ণদাসের নিজের দেওয়া বিবরণ থেকে আমরা জানি, মহাপ্রভুর আদ্যন্ত চরিতবর্ণনা নানা কারণে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। মহাপ্রভুর জীবনের কতকগুলি ঘটনা কৃষ্ণদাস বেছে নিয়েছেন এবং যথাসম্ভব পারম্পর্য রক্ষা করে সেগুলিকে একটি অত্যন্ত সুসংবদ্ধ কাহিনীর আকৃতি দিয়েছেন। মনে হয় কৃষ্ণদাসের মধ্যে নাট্যকারসুলভ দৃশ্যরচনার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। ফলে তিনি কতকগুলি অসামান্য নাট্যমুহূর্ত রচনা করেছেন। যেমন মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার দৃশ্য। এই দৃশ্যটি রচনার মধ্য দিয়ে যে নাট্যকৌশলের পরিচয় মেলে—তা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট। প্রথমে সেই পরম মিলনমুহূর্তটি রচনার জন্য নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর রায় রামানন্দ প্রণাম করলে—"উঠি প্রভু কহে উঠ কৃষ্ণ কৃষ্ণ/তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥" (মধ্য/৮) এই পরিচ্ছেদে পরিবেশ রচনায় এবং ইঙ্গিতময় ভাষা ব্যবহারে কৃষ্ণদাসের নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। নীরস তত্ত্বদর্শনকে সংলাপের মধ্য দিয়ে শুধু চারুরূপে পরিবেশন করা হয়েছে তাই নয়—তাকে পাঠকের কাছে উপভোগ্য করে তোলার জন্য বাচিক এবং কায়িক বিভিন্ন রীতি গ্রহণ করা হয়েছে। 'না সো রমণ'—গানটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু রামানন্দের মুখ স্বহস্তে আচ্ছাদন করেছেন। এখানে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা টীকা টিপ্পনী সংযুক্ত হয় নি। ভক্ত-রসিক দীর্ঘকাল সেই নাটকীয় দৃশ্যটি অন্তরে প্রত্যক্ষ করেছে এবং তার নানা ব্যাখ্যা মনে মনে রচনা করে নিয়েছে। কবির কাব্যে এইভাবে যেটুকু বলা হয়েছে তার থেকে না বলা অংশই বেশি থেকে যাওয়ার ফলে ব্যঞ্জনাঘন কাব্যরস সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

কৃষ্ণদাসের কাছে মহাপ্রভু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভাববিগ্রহ। তিনি নিত্য স্মরণ-মননের সামগ্রী। কিন্তু ভগবৎলীলার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা শ্রীচৈতন্যের মানব-লীলাকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়েছেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভু মানবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ফলে এই গ্রন্থে শুধু মহাপ্রভুর অধ্যাত্মজীবন নয়—তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রও স্থান পেয়েছে। সেই সঙ্গে কাব্যটিতে এসেছে আরও অসংখ্য চরিত্রের শোভাযাত্রা। যার মধ্যে আছেন রাজা, রাজমন্ত্রী থেকে শুরু করে—একেবারে দীনহীন সাধারণ মানুষ পর্যন্ত।

সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরকে কবি যেন আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষবৎ করে তুলতে চেয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত গৌণ চরিত্রগুলি কাব্যের মধ্যে অল্প স্থান লাভ করেছে। কিন্তু সেই স্বল্প পরিসরে অল্প দু চারটি রেখায় এক একটি চরিত্রকে কবি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—তা শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যকারের পক্ষেই সম্ভব। তবে চৈতন্যচরিতামৃত মানবরসপুষ্ট কাব্য হলেও তার মধ্যে সংগত কারণে আধ্যাত্মিক রসাবেগ সর্বাধিক প্রাধান্যলাভ করেছে। সেখানে কথাকারকে হয়তো গীতিমূর্চ্ছনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবানুভূতি পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন অংশে গীতিকবিতা রচনায় কবির নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। স্পষ্টই বোঝা যায়—কৃষ্ণদাস ইচ্ছা করলে পদাবলী কাব্য রচনাতেও সাফল্যপ্রদর্শন করতে পারতেন। বিশেষভাবে ত্রিপদীর আকারে রচিত মন্ময় ভাবানুভূতির প্রকাশ গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই সব অংশে ঘটেছে কবির অন্তরের অকপট আত্মনিবেদন। সেখানে সাময়িকভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসা বা পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন অপ্রধান হয়ে গেছে। ভক্তির আবেগস্পর্শে দুরূহ তত্ত্বও আবার কখনও লিরিক মাধুর্য লাভ করেছে। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে আধুনিক পাঠকের তাই মনে হয়েছে—"কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই ভাবনিয়ন্ত্রিত চৈতন্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার অন্তরালে পদাবলী সাহিত্যের সমস্ত সংগীতমূর্চ্ছনা—রূপোন্মাদ ও আবেগ কল্লোল নিঃশব্দে আত্মগোপন করিয়া আছে।"

তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কখনই প্রচলিত অর্থে কবিত্ব করার জন্য কবিত্ব করেন নি। বরং পরম বিনয়ের সঙ্গে তিনি জানান—"অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে/যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে।" (অন্ত্য/২০) কিন্তু কার্যত কৃষ্ণদাসের বাণীকে অনিপুণ বলা যায় না। চিত্রাঙ্কনে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতার পরিচয় মিলবে এই ধরনের বর্ণনায়—"অন্ন ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী/তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি।" (মধ্য/১৩) অথবা—"জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা সুনির্মল/গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না করে ঝলমল।" (অন্ত্য/৩) আসলে স্বাভাবিক কবিদৃষ্টির অধিকারী বলেই যে কোন বর্ণনার ক্ষেত্রেই কৃষ্ণদাসের ভাষা কবিত্বমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। একটি বর্ণনায়—"মুক্তাহার বক পাঁতি/ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি/পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার/কৃষ্ণ নব জলধর/জগৎ শস্য উপর/বরিষয়ে লীলামৃত ধার॥" (মধ্য/১১)

লক্ষণীয়, অন্তরের প্রবল ভাবাবেগ কবিকে কখনও সেইভাবে আপ্লুত করে না—যার ফলে সব কিছু প্লাবিত বা নিমজ্জিত হবে। বরং বলা যায় ভাস্করসুলভ মনোভাব নিয়ে কবি ভাষা-প্রতিমা রচনা করেছেন। সেখানে আশ্চর্য সংযম—সেখানে মন্ময়তার পরিবর্তে এক ধরনের তন্ময়তা। ফলে ভাবব্যাকুল মুহূর্তের বর্ণনাতেও কবি সেই আত্মসচেতনার পরিচয় দেন—যা একমাত্র বড়ো শিল্পীর

রচনাতেই দেখা যায়। যেমন "প্রভু বলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা/আকাশে উড়িয়া যাও পাও আর পাখা।" (আদি/১০) অথবা, "আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি/সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি।" (অন্ত্য/২০)

মানবমহিমার মহাকাব্য

বৈষ্ণব ভক্ত মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবানরূপে জানেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু স্বয়ং ভগবান্।' (আদি/১)। কিন্তু চৈতন্যদেবের মর্ত্যে অবতারলীলা বর্ণনাকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর মানবমহিমাকেই সমধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর যেন দুই রূপ প্রকাশিত হয়েছে—একদিকে তিনি অন্তর্যামী ভগবান্, অন্যদিকে ভক্তশ্রেষ্ঠ মানব।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর যে ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি। শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনের উপস্থাপনায় তাঁর রঙ্গপ্রিয়, তর্কপটু এমনকি কলহপরায়ণ রূপ বর্ণিত হয়েছে। আবার সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভুর মধ্যে একদিকে যেমন ভাবগাম্ভীর্য এবং চরিত্রের বিরাটত্ব প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রাত্যহিক জীবনে স্নেহ মায়ামমতায় পরিপূর্ণ এক মহান্ মানুষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কৃষ্ণদাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্য কখনও ভোলেন নি যে তিনি মানবদেহধারী। বৃন্দাবন ভ্রমণকালে আপন সঙ্গীর কাছে ঋণ স্বীকার করে বলেছেন—"তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন/এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন।" (মধ্য/১৮)

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্যকে মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কঠোর আচরণ করতে হয়েছে। অন্তরের অনেক দুর্বলতাকে পরিহার করে শুদ্ধ সংযত কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে তাঁর জীবন কেটেছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর অদ্বৈত আশ্রমে থাকার সময় তিনি বলেন "সন্ন্যাসীর ধর্ম নয় সন্ন্যাস করিয়া/নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব করিয়া।" (মধ্য/৩) জাগতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সাবধানতার কথা কৃষ্ণদাস বলেছেন—"প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী/কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি।" (মধ্য/১২) সম্ভবত এই জন্যই রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুকে অগাধ শ্রদ্ধা করলেও এবং মহাপ্রভুও প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হয়েও সন্ন্যাসী হিসাবে রাজদর্শনে তিনি বারে বারে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অনুরূপভাবে রায় রামানন্দের ভাই গোপীনাথ রাজার ঋণ শোধ করতে না পেরে শাস্তি পাচ্ছে জেনেও মহাপ্রভু রাজার কাছে গোপীনাথের জন্য কোন অনুরোধ করেন নি। ব্যক্তিগত স্নেহ বা বাৎসল্যবোধ অনুভব করলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে

রাজার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা বা রাজশাসনবিধির পরিবর্তন ইচ্ছা তাঁর কাছে কাম্য মনে হয় নি। রামানন্দ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পার্ষদ হলেও নির্লিপ্তভাবেই তিনি বলেন "রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কিবা দোষ।"

মহাপ্রভুর মধ্যে যেমন কখনও বজ্রাদপি কঠোর চরিত্রবলের প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি আবার আবেগ-বিহ্বল স্নেহ-দৌর্বল্যের প্রকাশও লক্ষ্য করা গেছে। প্রতি বৎসর মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য গৌড়দেশ থেকে বহু ক্লেশ সহ্য করে ভক্তরা আসতেন। তাঁদের জন্য ব্যথিত হয়ে তিনি বলে উঠেছেন "প্রতি বর্ষে আইস সবে আমাকে দেখিতে/আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে।" (অন্ত্য/১২) মহাপ্রভুর সন্ন্যাসী জীবনের কঠোর নিয়মপালন জগদানন্দকে ব্যথিত করেছে। তিনি মহাপ্রভুর জন্য সুগন্ধী তৈল সুদূর গৌড় থেকে নীলাচলে বয়ে নিয়ে গেছেন। মহাপ্রভুর কষ্ট হয় দেখে তিনি তুলার বালিশ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু কঠোর হয়ে সেজন্য জগদানন্দকে তিরস্কার করেছেন। আবার অভিমান করে জগদানন্দ উপবাস করলে মহাপ্রভু সাগ্রহে তার গৃহে আহার করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। জগদানন্দের বৃন্দাবনযাত্রাকালে পথে দুর্বৃত্তের হাত থেকে তাঁকে সাবধান হতে বলেছেন। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব মহাজনদের সঙ্গে ব্যবহারকালেও কিরূপ সতর্কতাগ্রহণ প্রয়োজন তা জানিয়েছেন "দূরে রহি ভক্তি করি সঙ্গে না রহিবা/তাঁর সবার আচারচেষ্টা লইতে না পারিবা।" (অন্ত্য/১৩)

গম্ভীরায় শঙ্করপণ্ডিত মহাপ্রভুর সেবার জন্য থাকতেন। একদিন শীতের রাত্রে—"উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়/প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়।" (অন্ত্য/১৯)

মহাপ্রভু কখনও তাঁর ভগবত্তা নিয়ে গর্ব করেন নি। বরং নরলীলায় নানা মানবিক দুর্বলতার কথাই তিনি বলেছেন—"দর্শন দূরে থাক প্রকৃতির নাম যদি শুনি/…তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু মন।" (অন্ত্য/৪) এইভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুকে প্রাণবন্ত মানবচরিত্রে পরিণত করেছেন। এর ফলে চৈতন্যচরিতামৃতের কাব্যগুণ শুধু বাড়ে নি—পরোক্ষভাবে তা চৈতন্যতত্ত্ব-ব্যাখ্যারও সহায়ক হয়ে উঠেছে।

'চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস'

গৌর লীলামৃত সিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহে অবগাহ সাধ॥ (আদি/১২)

ভারতবর্ষে তখন আফগান তথা পাঠান শাসন চলছে। দিল্লীতে লোদীবংশ সিংহাসন অধিকার করে রয়েছে। ভারতবাসী আপন সামাজিক, নৈতিক, চরিত্রগত আদর্শকে জাগিয়ে রাখবার জন্য ব্যাকুল। জাতীয় জীবনে নতুন মূল্যবোধের সন্ধান চলছে। আত্মশক্তির উন্মোচনের জন্য অন্তরের সঞ্চিত ক্ষোভ প্রকাশ বেদনায় মথিত হচ্ছে। এমনই এক মানসিক বাতাবরণের মধ্যে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হলেন। চিত্তস্ফূর্তির বদ্ধদশা ভাঙবার জন্য সব অবরোধ অপসারিত করে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনাময় উদ্গতিকে মূর্ত করে তোলবার এক ঘটনাময় ক্ষণ সেদিন এসেছে। ভারতবাসীর চিত্তের সুর বাঁধা আছে ধর্মের সূতায়। গ্রহণ স্নান উপলক্ষে মানুষ ঘর ছেড়ে ভক্তি বিনিময়ের বিচিত্র উৎসবে হয়েছে সম্মিলিত। যুগ যুগান্তের সাক্ষী হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছেন যে জাহ্নবী—তাঁর স্মৃতিমূলে এসে সকল মানুষ নিবেদন করছে অন্তরের আকুতি। মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব বর্ণনা করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখছেন—"নদীয়া উদয়গিরি / পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি / কৃপা করি হইল উদয়॥ পাপতমো হৈল নাশ / ত্রিজগতের উল্লাস / জগভরি হরিধ্বনি হয়॥" (আদি/১৩)

সিংহরাশিতে সিংহলগ্নে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ধরাধামে এসেছিলেন। এই দিনটির জন্য অদ্বৈত আচার্য কতকাল পথ চেয়ে "গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ/ কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ।" (আদি/৩) আজ সেই শুভলগ্নে আচার্য "হরিদাস লঞা সঙ্গে হুঙ্কার কীর্তন রঙ্গে।" অদ্বৈত ঘরণী সীতা ঠাকুরাণী নবজাতককে দেখতে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন "সুবর্ণের কড়িবৌলি" "রজতমুদ্রা পাশুলি" "দিব্যশঙ্খ" "ব্যাঘ্রনখ" "কটি-পট্টসূত্র" আর "দূর্বা ধান্য হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন"। নবজাতকের দিব্য দ্যুতি দেখে বাৎসল্যে তাঁর হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে। রূপে যেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—"বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত।" শিশুর দেহের বর্ণ কৃষ্ণাভ নয়—সদ্যপ্রস্ফুট চাঁপাফুলের মত গৈরিক। পাছে কোন অনিষ্ট হয় এই আশঙ্কায় তিনি শিশুর নাম রাখলেন 'নিমাই'। নিমগাছ হলো তিক্ত আস্বাদের প্রতীক। শচীমাতার মুখে এই নাম বহুবার উচ্চারিত হয়ে

আকাশে বাতাসে যেন আজও ভেসে বেড়াচ্ছে। পাঁচশত বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের প্রথম জীবন তেমন সুখের হয় নি। কারণ—"জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর উদরে/অষ্টকন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে॥" (আদি/১৩) তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করলেন। তখন তাঁর গৃহে দুটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে। প্রথমটির নাম রাখেন বিশ্বরূপ। দ্বিতীয়টির নামকরণ হয় নিমাই তথা বিশ্বম্ভর এবং পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

"ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন"—এগুলি শ্রীহরির চরণ চিহ্ন। নিমাইয়ের শিশুচরণে শচীমাতা সেই সকল চিহ্ন দেখে বিস্মিত হলেন। শিশু বড়ো হয়ে ওঠে। দুরন্ত হয়ে অতিথিবিপ্রের অন্নে হাত দিয়েছে এই বালক। হাত দিয়েছে গৃহ আরাধিত বিষ্ণুর নৈবেদ্যে। অন্যান্য সহপাঠীর সঙ্গে পাড়াপড়শীর ঘরে চুরি করে লোভনীয় আহার্য গ্রহণ করেছে। রাগ করে ঘরের তৈজসপত্র ভেঙেছে। গঙ্গাস্নান করতে আসতো যে সব কুমারীরা তাদের নৈবেদ্যে হাত দিয়ে পরম সুন্দর স্বামী হবে—এই আশ্বাসে শান্ত করেছে "পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান/সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান॥" (আদি/১৪) একান্ত কেউ না মানলে বলেছে—"বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী।" মধ্যযুগের চিরদুঃখের অভিশাপ—এইসব হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তারই মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে নিমাইয়ের শৈশবের দিনগুলি।

তাঁর পঠনপাঠন শুরু হলো। "কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল/অল্পদিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর লিখিল॥" (আদি/১৪) গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে মহাপ্রভু অধ্যয়ন করতে এলেন। তিনি শিশুকাল থেকেই মেধাবী। এই সময় একটি ঘটনা ঘটে। তাঁর বড়োভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। তখন পিতা জগন্নাথ মিশ্র নিমাইয়ের পাঠ বন্ধ করে দেন। তিনি মনে করলেন শাস্ত্রানুশীলনের ফলেই হয়তো 'সংসার অনিত্য' বলে বিশ্বরূপের ধারণা হয়েছিল। ইতিমধ্যে নিমাইয়ের অশিষ্টাচার আর দৌরাত্ম্য চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। তখন শচীমাতার অনুরোধে নিমাইকে পুনরায় টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পাঠানো হয়। অল্পদিনে তিনি ছাত্রদের অগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে নিমাইয়ের পিতৃবিয়োগ হয়েছে। সংসারের সুখ দুঃখের টানাপোড়েনে দিন কাটে তাঁর।

গঙ্গাস্নানের পথে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিবিনিময় হয়েছিল। মাতা শচীদেবীর অনুবন্ধে বনমালী ঘটকের আনুকূল্যে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়।

তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্ট জেলায় নিমাইয়ের পূর্বপুরুষের বাসস্থান। মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যাওয়া মনস্থ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যাবিতরণ। তিনি নিজে

সাধারণতঃ ব্যাকরণ পড়াতেন। "বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে/শত শত পড়ুয়া আসি লাগিল পড়িতে।" (আদি/১৬)

এই সময় সুকৃতী তপন মিশ্র মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হয়ে বলেন—"বহু শাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।" মহাপ্রভু তাঁকে ব্রহ্মপুরাণ থেকে "ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর" মন্ত্র দান করেন এবং শ্রীবিষ্ণুর ভজনা করতে বলেন। তখন থেকে মহাপ্রভু সর্বপ্রথম নাম সংকীর্তন প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর জীবনমার্গের একটি বিশেষ দিক পরিবর্তনের সূচনা এই পূর্ববঙ্গ থেকেই হয়।

তপন মিশ্রকে মহাপ্রভু কাশীধামে বাস করার আদেশ দিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি যখন ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবনযাত্রা করেছিলেন তখন যাবার এবং আসার সময় কাশীতে তপন মিশ্রের গৃহে ছিলেন। এই তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ 'ভট্ট', কাশীতে মহাপ্রভু থাকার সময় প্রথম তাঁর সান্নিধ্যলাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। "ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিল শয়ন/মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসংবাহন॥" (মধ্য/:৭) এই রঘুনাথ ভট্ট ষড়্গোস্বামীর অন্যতম একজন হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম ও কৃষ্টির জন্য সারাজীবন সাধনা করেছেন।

মহাপ্রভু নবদ্বীপে ফিরে এলেন। এসে শুনলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধানের কথা। বিমর্ষ মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, কাল গতিতে ভবিতব্য নিয়ে অনিত্য সংসার এমনি করেই বয়ে চলেছে।

পুনরায় তিনি মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল বসিয়ে ছাত্র পড়াতে লাগলেন। পাণ্ডিত্য প্রতিভায় নবদ্বীপ জাগ্রত হয়ে ওঠে। গঙ্গাস্নানের পথে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হয়। রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে নিমাই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

এই সময় জনৈক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ভারতবর্ষের বহু বিদগ্ধজনকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করে নবদ্বীপে আসেন। গঙ্গাতীরে মহাপ্রভু বসে আছেন—"জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে/বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে॥" (আদি/১৬) এমন সময় দিগ্বিজয়ী সেখানে এসে উপস্থিত। মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর শাস্ত্র আলোচনা হয়। গঙ্গার স্তব রচনা করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি তিনি দাবী করেন নিমাইয়ের কাছে। নিমাই নিজে পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁর ছিল না। আপন প্রকৃতিগত বিনয়ভঙ্গী নিয়ে তিনি দিগ্বিজয়ীর 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ', 'বিরুদ্ধমতি', 'ভগ্নক্রম', 'পুনরাত্ত'—এই দোষগুলি দেখালেন। দিগ্বিজয়ী বিস্মিত। সামান্য টোলে "কলাপ ব্যাকরণ" পড়ান—নিমাইয়ের এই পরিচয়টুকুই তিনি পেয়েছিলেন। টোলের অধ্যাপক যে তাঁকে এতখানি পর্যুদস্ত করে দেবেন—তা তিনি ধারণাই করতে পারেন নি—"মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত।" এরপর নিমাই নিজেকে সংযত করে নেন। তিনি বললেন ব্যাকরণের নিগড় ছিন্ন করে চিরদিন কাব্য-যমুনা প্রবাহিত হয়ে চলে। ছোটখাটো

শব্দ ছন্দ অলংকারের ত্রুটি বড়ো কথা নয়—"কবিত্ব করণে শক্তি তাঁহি সে বাখানি ॥" এর পরের ঘটনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বললেন—"তবে তো করিলা প্রভু গয়াতে গমন/ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথায় মিলন ॥" (আদি/১৭) পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্ম সমাপনের জন্য মহাপ্রভু গয়াধামে এসে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মচিহ্ন দর্শন করেন। তাঁর অন্তরে ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের স্মৃতি জাগরূক হয়ে ওঠে। দু'নয়নে অবিরল জলধারা প্রবাহিত হতে থাকে। মনের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে যায়। দীক্ষা দিতে বললেন মহাপ্রভু। ঈশ্বরপুরী 'দশ অক্ষর মন্ত্র' মহাপ্রভুকে দান করলেন।

যে নিমাই পণ্ডিত গয়ায় গিয়েছিলেন তাঁর আমূল পরিবর্তন হয়েছে, ফিরে এলেন যেন আর একজন। পাণ্ডিত্য গৌরবের ঔদ্ধত্য আর নেই। শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর দৈন্য আর্তিযুক্ত পরম ভাগবত মূর্তি তাঁর মধ্যে প্রকটিত হতে থাকলো। তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে ছাত্রদের কাছে স্বীকার করলেন—"আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার।"

কাব্য রচনার অবসরে মহাপ্রভুর জীবনের সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনায় জড়িত বৈষ্ণব আচার্যগণের প্রসঙ্গ বলে নিয়েছেন কবিরাজ গোস্বামী। অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস, খোলাবেচা শ্রীধর—এঁদের সঙ্গে মহাপ্রভুর শ্রদ্ধা, প্রীতির সম্পর্ক অনুপমভাবে ফুটে উঠেছে এই কাব্যে।

অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর চেয়ে বয়সে বড়ো। চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বেই অদ্বৈত আচার্য ভগবানের আরাধনার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তিনি পথ চেয়েছিলেন এমন একজনের যিনি দীন দুঃখীর একান্ত সহায় হবেন। আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে আপন সহানুভূতির ছত্র-ছায়ায় বহু অকিঞ্চনকে আশ্রয় দিতে পারবেন। নিমাইয়ের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মানস-মূর্তিকে। অদ্বৈত আচার্য অত্যন্ত স্নেহ করতেন মহাপ্রভুকে। শান্তিপুরে প্রথম সন্ন্যাসের দিনগুলিতে কাতর অনুনয় জানিয়ে মহাপ্রভুকে বলেছেন—"আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস।" আবার 'ভক্তি' ও 'মুক্তি' নিয়ে দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্বও হয়েছে। অদ্বৈত আচার্য জানিয়েছেন—"মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বশিষ্ট ব্যাখ্যান/ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান।" পরিশেষে জীবের কল্যাণের ক্ষেত্রে মহাপ্রভু ও অদ্বৈত আচার্যের মত ও পথ মিলে গিয়েছিল একই রেখায়—"আচার্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান/আচণ্ডালাদিরে কহিও কৃষ্ণভক্তি দান ॥" (মধ্য/১৫)

এই সময় ভক্ত নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসেন। তিনি চৈতন্যের পরম অনুরাগী হয়ে ওঠেন। সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের প্রচারক হিসাবে নিত্যানন্দ সঙ্গী করে নিলেন হরিদাসকে।

সেই সময় নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে দুই মত্তপ দুর্বৃত্তের অত্যাচার চরমে ওঠে। গঙ্গাস্নানের যাত্রীদের উপর চলতো দুর্ব্যবহার। নিত্যানন্দ ঠিক করলেন

এই দুই দুরাচারীকেই আদর্শের পথে নিয়ে যাবার অগ্নিপরীক্ষা দেবেন তিনি। মত্তপ মাধাই 'মুটকী'র আঘাত করে নিত্যানন্দের উপর। রক্তে ভেসে যায় নিত্যানন্দের বুক। কিন্তু এই আঘাতের বেদনা সয়েও নিত্যানন্দ আবেদন জানালেন মহাপ্রভুর কারুণ্য ঘন প্রেমধর্মের। তখন জগাই এবং মাধাই উভয়েই পালটে গেল মনে প্রাণে।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কবিরাজ গোস্বামী বললেন—"শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান/যাঁর অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান॥" (আদি/১০) এই শুক্লাম্বর মহাপ্রভুর কৃপাধন্য এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। যদিও ভিক্ষোপজীবী, কিন্তু তিনি ভগবৎসাধনায় মনপ্রাণ নিবেদন করেছেন। তাঁর নিষ্ঠায় ও আন্তরিকতায় কোনো ফাঁক ছিল না। প্রতিদানলেশহীন শুক্লাম্বরের এই সাধনা মহাপ্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহাপ্রভু জানতেন ঝুলিতে দুটি চাল ছাড়া শুক্লাম্বরের আর কিছু নেই। তিনি শুক্লাম্বরের সব সংকোচ দূর করে একদিন জোর করেই তাঁর অঞ্চল থেকে একমুঠো শুকনো তণ্ডুল নিয়ে আপন শ্রীমুখে গ্রহণ করে বুঝিয়েছিলেন—আন্তরিকতাই হলো অমৃত, যার আস্বাদনে প্রেমভক্তি চরিতার্থতা লাভ করে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সবিস্তারে হরিদাস ঠাকুরের বর্ণনা করেন। মহাপ্রভুর নবধর্মের প্রচারে প্রথম দূত হয়েছিলেন নিত্যানন্দের সঙ্গে এই শ্রীহরিদাস। কথিত আছে হরিদাস আগে যবন ছিলেন। আর্তজীবের পরিত্রাণকারী শ্রীবিষ্ণুর প্রতি তিনি অনুরক্ত হন এবং পরম ভক্ত হয়ে ভগবানের নাম-মহিমা প্রচারে আজীবন অতিবাহিত করেন। জাতি বর্ণ সব কিছু ভুলে একান্তভাবে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের মধ্যে হরিদাসের যে আস্তিক্যবুদ্ধি ছিল—মহাপ্রভু তাকে পরম শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হৈতে/তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আঘাতে॥" (মধ্য/১১) মহাপ্রভু কখনও কারও কাছে কিছু চান নি। একমাত্র নিভৃতে সাধনা করবার জন্যে নীলাচলে কাশীমিশ্রকে বললেন—"আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে/একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে॥" এই আশ্রয়টুকু তিনি হরিদাসের জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন।

গয়াধাম থেকে ফিরে আসার পর মহাপ্রভু এমন কিছু গড়ে তুলতে চাইলেন যেখানে ভগবদ্ স্মৃতিকে ঘিরে সর্বসাধারণের হৃদয়ের যোগসাধন ঘটবে। স্মৃতিশাসিত সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বেড়া ভেঙে যাবে। মানবপ্রাণের উদার বিশাল দিকটি প্রকাশিত হবে। দিনের কাজ শেষে আপন পার্ষদদের নিয়ে সমবেত হলেন শ্রীবাসঅঙ্গনে—"তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর/রাত্রে সংকীর্তন কৈল এক সংবৎসর॥" (আদি/১৭) সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। মহাপ্রভু আগে নিজে সত্যকে উপলব্ধি করতে চাইলেন। নিজ আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি সত্যের প্রকাশ ঘটাবেন।

মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বিরোধিতা করবার লোকও দেখা দেয়। প্রচলিত

ভাবনা চিন্তায় তখন আলোড়ন আসছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, জ্ঞানী, নিরক্ষর নির্বিশেষে ভগবানকে উপলব্ধি করার অবাধ চিরন্তন অধিকার প্রতিটি মানুষের থাকবে—এই সত্য সকলে ভালো চোখে দেখল না। নদীয়ায় তখন যত যবন ছিল—সংকীর্তনের অভিনবত্বে হতচকিত হয়ে চাঁদ কাজীর কাছে নালিশ করলো। বিরোধী হিন্দুরাও যোগ দিয়ে বললো—"কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ্ বাড় বাড়/এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥" (আদি/১৭) এক সন্ধ্যায় কাজী এক ভক্তের বাড়ীতে এসে কীর্তনের মৃদঙ্গ ভেঙে দেন। লোকে শোকার্ত হয়ে সেই সংবাদ মহাপ্রভুর কাছে নিবেদন করে।

মহাপ্রভু বললেন—"নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন।" সকলকে সংঘবদ্ধ করে তিনি বললেন—"সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে/দেখি কোন কাজি আসি মোরে মানা করে॥" (আদি/১৭) তিন সম্প্রদায়ে তিনি ভক্তদের সাজালেন, নেতৃত্ব দিলেন হরিদাস, অদ্বৈত আচার্য এবং তিনি নিজে। পাশে রাখলেন নিত্যানন্দকে। এই একতাবদ্ধ শক্তির কাছে কাজীর ঔদ্ধত্য কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেল। আবার নির্বিঘ্নে সংকীর্তন চলতে লাগলো।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বললেন—"খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস/যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥" (আদি/১০) শ্রীধর ভগবানের চরণে ঐকান্তিক আত্মনিবেদন করেছেন। কলাগাছ থেকে পাওয়া 'খোড়' বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নির্দ্বিধায় ভগবানের নাম গুণগান করতেন। এই বলিষ্ঠ জীবনবোধকে মহাপ্রভু শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কাজীর বাড়ি থেকে ফেরবার পথে মহাপ্রভু সকল ভক্ত সহিত শ্রীধরের বাড়ি গিয়ে ওঠেন। অতিথি আপ্যায়ন করার মতো কিছুই নেই শ্রীধরের গৃহে। তবুও কুটীরপ্রান্তে লৌহপাত্রে রাখা জল পরম প্রীতির সঙ্গে পান করে আতিথেয়তার পরিপূর্ণতা আনলেন মহাপ্রভু।

মহাপ্রভু দেখলেন নবদ্বীপের চৌহদ্দিতে একান্তভাবেই আপন জনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ছেন তিনি। যে অহৈতুকী প্রেমভক্তির দীপশিখা অন্তরে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে—তার আলো ছড়িয়ে দিতে চাইলেন বৃহৎ জগৎ সংসারে। তাঁর বাণীর মর্ম যে নবদ্বীপে তখন সকলেই গ্রহণ করতে পেরেছে তা নয়। তাঁর সমর্থক যেমন বেড়েছে—বিরোধীচক্রও তেমনি প্রসারিত হয়েছে। কাকেই বা তিনি অনুগ্রহ করবেন আর কাকেই বা তিনি নিগ্রহ করবেন। তিনি দেখলেন ভারতক্ষেত্রে সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর প্রতিই সকলে প্রণতি জানায়—তাঁর কথাই সকলে শোনে। সন্ন্যাসীর আপন পর বলে কিছু থাকে না। বন্ধনহীন সন্ন্যাসজীবন এইসময় তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। কেশবভারতী নদীয়ায় এসেছেন। মহাপ্রভু তাঁর কাছে কাতর মিনতি জানালেন—"তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ/কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন॥" (আদি/১৭) মহাপ্রভু কাটোয়ায় চলে আসেন। তাঁর সন্ন্যাসের সংকল্পে—"সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য/মুকুন্দ

দন্ত এই তিন কৈল সর্বকার্য ॥" (আদি/১৭) ক্ষৌরকার মস্তকমুণ্ডন করবেন। অনিন্দ্যকান্তি বিশ্বম্ভরের চাঁচর কেশ মুণ্ডন করতে তিনি ব্যথা পাচ্ছেন। এদিকে সময় চলে যায়। সূর্যাস্তের প্রাক্কালে কেশবভারতী গৈরিকবেশধারী গৌরকান্তি মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম দিয়ে সন্ন্যাস আশ্রমের দীক্ষামন্ত্র দান করলেন।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করে রাঢ়দেশ বক্রেশ্বরের পথে ঘুরে কৃষ্ণনাম প্রচার করেন মহাপ্রভু। তারপর শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে সকল বৈষ্ণবের সঙ্গে মিলিত হন। ভক্তসমাগমে সেদিন "আচার্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।" কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখছেন—"গৌরদেহ কান্তি সূর্য জিনিয়া উজ্জ্বল/অরুণ বস্ত্র কান্তি তাহে করে ঝলমল ॥" (মধ্য/৩) মাতা শচীদেবীকে আনয়নের আয়োজন করা হয়। মুণ্ডিতমস্তক প্রাণের নিমাইকে দেখে শ্রাবণের ধারার মতো শচীমাতার দুনয়নে অশ্রু বয়ে যায়। দুঃখিনী জননী। আট কন্যা তাঁর অকালে চলে গেছে। কিশোরপুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে আর ফিরে আসে নি। স্বামীহারা হয়েছেন। শেষ বয়সের একমাত্র সম্বল নিমাইও সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ঘরে কিশোরী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। কি বলে তিনি তাকে সান্ত্বনা দেবেন। দুচোখ জলে ভরে ওঠে। মহাপ্রভুরও চোখে জল। তিনি বললেন—"কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে।"

মহাপ্রভু একদিন ভক্তদের ডেকে বললেন—"সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া/ নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥" (মধ্য/৩) অতি দুঃখের মধ্যেও শচীমাতাকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো—"আপনার সুখ দুঃখ তাহা নাহি গণি/তাঁর যেই সুখ সেই নিজ করি মানি ॥" (মধ্য/৩) মহাপ্রভু সকলকে আশ্বস্ত করে যাত্রা করলেন নীলাচলের পথে।

চৈতন্যদেব শান্তিপুর ত্যাগ করে আটিসারা গ্রাম হয়ে ছত্রভোগ নামক স্থানে এসে রামচন্দ্র খানের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তখন উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার বিবাদ চলছে। রামচন্দ্র খান সাবধানে রাত্রির অন্ধকারে রাজ্যসীমানা পার করে দেন। জলেশ্বর হয়ে মহাপ্রভু রেমুনায় আসেন। সেখানে গোপীনাথের মন্দির দর্শন করেন। তারপর কটকে সাক্ষীগোপাল মূর্তি দর্শন করে চলে আসেন ভুবনেশ্বরে। সেখানে শিবমূর্তি দর্শন করে আঠারনালা হয়ে এসে পৌছালেন শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে। তিনি দ্রুত এগিয়ে এলে তাঁর সঙ্গীরা পিছনে পড়ে থাকেন। জগন্নাথ দর্শনে মহাপ্রভু আনন্দে আকুল, আবেগে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে সার্বভৌম তাঁকে আপন ঘরে নিয়ে এসে পরিচর্যা করেন। ইতিমধ্যে সঙ্গীরা এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য পরমানন্দপুরী, সংগীতবিশারদ দামোদর স্বরূপ, রাজা প্রতাপ-রুদ্রের রাজকর্মচারী বিদ্যানগরের রায় রামানন্দ এই সমস্ত মনীষীর সঙ্গে মহাপ্রভুর দিন কাটতে থাকে।

'রথযাত্রার সময় আনন্দের আর অবধি থাকতো না। সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত

হয়ে মহাপ্রভু ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনে যোগ দিতেন। অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাস, সত্যরাজ খান, নরহরি দাস—এই সাতটি সম্প্রদায়। মহাপ্রভু আপন শ্রীমুখে গাইছেন—"সেই সেই তো পরাণনাথ পাইনু। যাঁহা লাগি মদন দহনে দহি গেনু॥" (মধ্য/১৩) এমনি করে কীর্তনের আনন্দে চারদিক মুখরিত হতে থাকে—তার মধ্যে এগিয়ে চলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ। "দণ্ডবৎ করি প্রভু জুড়ি দুই হাত/উর্ধ্বমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥" (মধ্য/১৩) চার মাস থেকে ভক্তরা নীলাচল থেকে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন কালে গাঁথা হয়ে ওঠে বিরহ-বিধুর অশ্রুজলের মালা। শ্রীবাস পণ্ডিতের হাতে মাতা শচীদেবীর জন্য জগন্নাথ-দেবের প্রসাদ পাঠাচ্ছেন মহাপ্রভু—"এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এসব প্রসাদ/দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ॥" (মধ্য/১৫) বহুপথ পায়ে হেঁটে এসেছেন অদ্বৈত আচার্য। বিদায়ের মুহূর্তে পরম শ্রদ্ধায় মহাপ্রভু জানালেন—"আইলেন আচার্য গোসাঞি মোরে কৃপা করি/প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি শুধিতে না পারি॥" (অন্ত্য/১২)

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরোবেন। একাই যেতে চান। কিন্তু নিত্যানন্দ অনুনয় করে বললেন—"কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ/ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥" (মধ্য/৭) সার্বভৌম অনুরোধ করলেন বিদ্যানগরের পথে 'রসিকভক্ত' রায় রামানন্দের সঙ্গে অবশ্য দেখা করতে। মহাপ্রভু কূর্মস্থান, জিয়ড়নৃসিংহক্ষেত্র হয়ে চলে আসেন গোদাবরীতীরে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ছবি আঁকছেন—"ঘাট ছাড়ি কত দূরে জল সন্নিধানে/বসিয়া করেন প্রভু নাম সংকীর্তনে।" (মধ্য/৮) সেখানে রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হলে সাধ্য এবং সাধনের তত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনা হয়। তারপর মহাপ্রভু মল্লিকার্জুনতীর্থে মহেশ দর্শন করে সিদ্ধবট নামক স্থানে সীতাপতি রামচন্দ্রমূর্তি দর্শন করেন। স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমল্ল হয়ে বেঙ্কট অঞ্চলে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করেন। শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী হয়ে ঋষভপর্বতে এসে নারায়ণমূর্তি দর্শন করলেন। সেখানে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য পরমানন্দপুরীর বন্দনা করেন তিনি। সেতুবন্ধে রামেশ্বর মূর্তি দর্শন এবং তাম্রপর্ণী, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ, চামতাপুর হয়ে—"মলয় পর্বতে কৈল আগস্ত্য বন্দন/কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন॥" (মধ্য/৯) পয়স্বিনীতীরে আদিকেশব মন্দির দর্শন করে সিংহারিমঠে শঙ্করাচার্যের মন্দিরে আসেন। মৎস্যতীর্থ হয়ে তুঙ্গভদ্রায় স্নান করে পাণ্ডুপুরে এসে শুনলেন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী রয়েছেন। মহাপ্রভু তাঁর বন্দনা করেন। তিনি শুনলেন এই তীর্থে তাঁর বড়োভাই বিশ্বরূপ তথা শঙ্করারণ্য সন্ন্যাসীর সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়েছে। লুপ্ততীর্থ, লুপ্তগ্রন্থ উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুর আগ্রহের অন্ত ছিল না। পয়স্বিনীতীরে আদিকেশব মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়টি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নকল করিয়ে নেন। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণমহিমা বর্ণিত আছে। আরও কিছু দর্শনীয় স্থান হয়ে মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরে আসেন। দাক্ষিণাত্য থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন

করে মহাপ্রভু সেখানে কিছুদিন রইলেন। তারপর বৃন্দাবন পরিভ্রমণে বেরোলেন। এই সময় জননী ও জাহ্নবীকে একবার দর্শন করবার জন্য তিনি গৌড়ে আসেন। রামকেলিগ্রামে মহাপ্রভু এলে রূপ ও সনাতন আকুল আর্তি নিয়ে মহাপ্রভুর কাছে আত্মনিবেদন করেন। "দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল/প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল॥" (মধ্য/১) মহাপ্রভু তাঁদের আপন পারিষদমধ্যে গ্রহণ করলেন।

মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যেতে চান। কিন্তু বহু ভক্ত তাঁর সঙ্গে। সনাতন বোঝালেন এভাবে দীর্ঘপথ যাত্রা ঠিক হবে না। মহাপ্রভু সনাতনের কথা মেনে নিলেন এবং নীলাচলে ফিরে এলেন।

এরপর ঝাড়খণ্ডের বনপথ ধরে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করলে সঙ্গে রইলেন বলভদ্র ভট্টাচার্য এবং অপর এক ব্রাহ্মণ। তিনি কাশীধামে মণিকর্ণিকায় স্নান করে বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করলেন। তারপর প্রয়াগ হয়ে—"মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রান্তিঘাটে স্নান/জন্মস্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম॥" (মধ্য/১৭) যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করে মহাপ্রভু দ্বাদশবন দর্শন করলেন। তাঁর আনন্দের আর অন্ত নেই—"অন্যদেশে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন' নামে/সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥" (মধ্য/১৭) মহাপ্রভু আরিটগ্রাম দর্শন করলেন। এইখানে শ্রীকৃষ্ণ আরিষ্টাসুরকে বধ করেছিলেন। এখানকার আরিষ্টকুণ্ডকে 'শ্যামকুণ্ড' বলে। একটি কাহিনী আছে। আরিষ্ট অসুর বৃষরূপ ধারণ করেছিল। তাকে হত্যা করাতে শ্রীরাধা বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতীর্থের জলে স্নান করতে হবে। সেই সর্বতীর্থের জলে এই সরোবর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। দুই ধান্যক্ষেত্রের মধ্যবর্তী একটি স্থানে লুপ্ততীর্থ 'রাধাকুণ্ডে'র অবস্থিতি অনুভব করে মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হন। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার সরসী'—এই স্মৃতি তাঁকে আনন্দিত করে তোলে। গিরি গোবর্দ্ধনে অন্নকূট গ্রামে গোপালদেব আছেন। এদিকে পাদস্পর্শ হবে বলে মহাপ্রভু গোবর্দ্ধন পাহাড়ে উঠবেন না। তুর্কী আক্রমণকারীরা আসছে—এই জনরবে ভক্তগণ ভগবান গোপালদেবকে নিয়ে গাঠুলিগ্রামে চলে আসেন। মহাপ্রভু মানসগঙ্গায় স্নান করে শ্রীগোপাল দর্শন করেন। সংগীত কীর্তনে দিন অবসান হয়ে যায়। তিনি শ্রীনন্দমহারাজের বাসস্থান নন্দগ্রাম হয়ে চলে আসেন 'শেষশায়ী'-তে। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আছেন এবং তাঁর চরণসেবায় রত—শ্রীরাধিকাবিগ্রহ আছেন।

শ্রীবলরাম 'প্রলম্ব' নামে অসুরকে বধ করেছিলেন 'ভাণ্ডীর বন' অঞ্চলে। 'লৌহজঙ্গ' অসুরকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেছিলেন 'লৌহবন' অঞ্চলে। 'যমল' এবং 'অর্জুন' নামে দুটি বৃক্ষ তিনি ছেদন করেছিলেন বলে 'যমলার্জুন' অঞ্চল বিখ্যাত। কংস কারাগারে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন 'মথুরায়'। বৃন্দাবন থেকে মথুরায় যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী ছিলেন অক্রুর। তাঁর নামাঙ্কিত স্থান 'অক্রুরতীর্থ'। কালিয় নাগকে দমন করে শৈত্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ সূর্যতাপ সেবন

করেছিলেন 'প্রস্কন্দন ঘাটে'। সখীদের সাহচর্যে শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ লীলা প্রকটিত করেছেন 'রাসস্থলীতে'। বস্ত্রহরণ লীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'চীরঘাটে'। মহাপ্রভু পরম প্রীতির সঙ্গে এই সকল তীর্থস্থান দর্শন করছেন। তারই সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করছেন—"বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে/নাম সংকীর্তন করে মধ্যাহ্ন পর্যন্তে।" (মধ্য/১৮) বৃন্দাবন ত্যাগের প্রাক্কালে বলভদ্র ভট্টাচার্যকে মহাপ্রভু বললেন—"তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন/এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন ॥" (মধ্য/১৮)

নীলাচলে ফিরে এসে অহৈতুকী প্রেম ও ভক্তির সাধনায় আত্মনিবেদন করেন মহাপ্রভু। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আর্তি এবং ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি বলেন—"তোমার দর্শন বিনে/অধন্য এই রাত্রি দিনে/এই কাল না যায় কাটন/তুমি অনাথের বন্ধু/অপার করুণা সিন্ধু/কৃপা করি দেহ দরশন।" (মধ্য/২) কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন—"ভক্তপ্রেমের যে দশা যে গতি প্রকার/যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার" (অন্ত্য/১৮)—তা সমস্তই মূর্তি ধারণ করছে মহাপ্রভুর মধ্যে। তিনি বিরহের আর্তিতে স্থির হয়ে থাকতে পারছেন না। কখনও গম্ভীরা থেকে বেরিয়ে "চটক পর্বত দেখি গোবর্ধন ভ্রমে/ধাঞা চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে।" (মধ্য/২) আবার কখনও বা ভগবানের সঙ্গে মিলনের স্মৃতির পরম সুখে—"উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান/তাহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান ॥" (মধ্য/২) নীলাচলে নিরবচ্ছিন্নভাবে বহুদিন মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে রাধাভাবে আবিষ্ট হয়ে ভগবানের শ্রীমুখমাধুর্য দর্শন করেছেন। তিনি শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখতেন—ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দররূপে।

অন্ত্যলীলায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর অপার্থিব ভাগবত জীবনকথার রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীরাধার ভাবে দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর দিন কাটে। ভাববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যে তিনি আবিষ্ট থাকেন। ভক্তরা তাঁর বাহ্যজ্ঞান নিয়ে এলে পরম করুণায় তিনি বলেন—"কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে/পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইমু দেখিতে ॥" (অন্ত্য/১৪) একবার চন্দ্রালোকিত রাত্রে যমুনাভ্রমে মহাপ্রভু সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দেন। সেবার তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তিনি নিজেকে ভুলে গেছেন। ভাবনেত্রে দর্শন করছেন—"কৃষ্ণ করে গোধন চারণে।" ভগবানের অপার সৌন্দর্য তাঁকে বিহ্বল করেছে। তাঁর 'নেত্র চাতক'—'না দেখি পিয়াসে মরি যায়।' মন তাঁর কৃষ্ণের বিয়োগে উৎকণ্ঠায় ভরা—"উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়/যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায়।" (অন্ত্য/১৪) মাধুর্যই ভগবত্তার সার—এই সত্যের বাণীমূর্তি অঙ্কন করে কবিরাজ গোস্বামী বললেন—"অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য মহিমা/আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা।" (অন্ত্য/১৭) পরম আকুতি নিয়ে তিনি

বলেন—"চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু/জগৎ আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু॥" (মধ্য/১৮) কবি বলছেন শ্রীমদনগোপালের কৃপাতেই তিনি ভক্তবৃন্দের কাছে মহাপ্রভুর জীবনের কাহিনী বর্ণনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। "শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি/কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি।" (অন্ত্য/২০) পরম শ্রদ্ধায় সকল ভক্তবৃন্দের কাছে প্রণতি জানিয়ে কাব্যে যবনিকা টানলেন কবি—"সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ/চৈতন্যচরিতবর্ণন কৈল সমাপন।" (অন্ত্য/২০)।

কাব্যপাঠ

১

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরমমহত্ত্ব॥" (আদি/২)

ভগবত্তার সার হলেন—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। তিনি বিরাটবস্তু। শক্তিতে, লীলায় ঐশ্বর্যে—কারও অপেক্ষা না রেখে স্বয়ংসিদ্ধ। তিনি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। মধুর আকর্ষণশক্তি, পৌরুষ, যশরাশি, অতুলরূপ, অপরিসীম জ্ঞান ও জাজ্বল্যমান বৈরাগ্য—এই ষড়বিধ ঐশ্বর্যে তিনি ভূষিত। তিনি জীবের আশ্রয়-স্বরূপ। সকল জীব তাঁর থেকেই প্রকাশিত। "অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে/তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥" (আদি/২)

শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণ। মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখ দূর করে আনন্দে বিমণ্ডিত করে তোলেন। তিনি অখিলরসামৃতমূর্তি। তাঁর আয়ত আঁখি—ঘন মেঘের মতো, অঙ্গের বর্ণ বিদ্যুতের রঙের মতো, বসনাঞ্চল—বনফুলের মাল্যে শোভিত—"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভ্যং বৈদ্যুতাম্বরম্/দ্বিভুজাং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥" তিনি গোপীদের প্রাণবল্লভ। সুমধুর বংশীরবে গোপীবৃন্দকে আকুল করে তোলেন—"শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ/কর্ষণে বেণুস্বনৈর্গোপী র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। তিনি সৎ—অর্থাৎ অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান আছেন, বর্তমানে আছেন—ভবিষ্যতেও অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন। তিনি চিৎ বস্তু অর্থাৎ চেতনাময়। তিনি নিজে অনুভব করেন এবং সকলকে অনুভব শক্তি দান করেন। তিনি আনন্দময় রসস্বরূপ অর্থাৎ "মধুরৈশ্বর্য, মাধুর্য, কৃপাদি ভাণ্ডার।"

তাঁর বহুবিধ শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান। চিচ্ছক্তি (স্বরূপশক্তি তথা অন্তরঙ্গা শক্তি), জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তি-র সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত লীলা বিলাস করে থাকেন। এই চিচ্ছক্তির আবার তিনটি বৃত্তি আছে—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। 'সন্ধিনী'—শক্তির দ্বারা ভগবান্ নিজের এবং অপরের সত্তাকে রক্ষা করেন। 'সম্বিৎ'—শক্তির দ্বারা নিজেকে জানেন এবং অপরকে জানান। 'হ্লাদিনী'—শক্তির দ্বারা নিজে আনন্দ অনুভব করেন, অপরকেও আনন্দ আস্বাদন করান।

শ্রীকৃষ্ণের 'জীবশক্তি' হলো তটস্থা শক্তি। তট সমুদ্রেরও নয়—উচ্চ তীরভূমিরও নয়। জীব কখনও অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ—আবার কখনও প্রাকৃত জগৎসুখের দিকে ধাবিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের 'মায়াশক্তি' জীবকে কৃষ্ণবহির্মুখ করে। তার স্বরূপের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করার মধ্য দিয়ে সংসারের সুখে এবং সংসারের দুঃখে অভিভূত করে।

২

"কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ করে আরাধনে
অতএব রাধিকানাম পুরাণে বাখানে।" (আদি/৪)

শ্রীরাধিকা হলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত মূর্তি। তিনি মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিনী। 'কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়' সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাঁর পরম কাম্য। শ্রীকৃষ্ণের বাসনার পরিপূরণ মানসে আরাধনা করেন বলে তাঁর নাম আরাধিকা তথা রাধিকা।

শ্রীরাধিকার চপল আঁখি, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, চারু সৌভাগ্যরেখায় দুই হস্ত শোভিত। তিনি রম্যবাক্, অঙ্গসৌরভযুক্তা, বিনীতা, লজ্জাশীলা, ধৈর্যগাম্ভীর্যময়ী। তাঁর যশোরাশিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত। তিনি গুরুজনদের স্নেহধন্যা, সখীদের অত্যন্ত প্রিয়া, অনুরাগের বশে শ্রীকৃষ্ণ সতত আজ্ঞাধীন বলে—সন্ততাশ্রবকেশবা।

শ্রীরাধার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, কায়—সমস্তের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম সর্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট। "কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে/যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥" (আদি/৪) তিনি 'গোবিন্দনন্দিনী', 'গোবিন্দমোহিনী', 'গোবিন্দ-সর্বস্ব'। তিনি কৃষ্ণগতজীবনা—কর্ণে তাঁর নামে, মুখে তাঁর যশোগানে সন্তুষ্ট হন। আত্মীয়, স্বজন, কুলধর্ম, বেদধর্ম, সর্বস্বত্যাগ করেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চেয়েছেন।

শ্রীরাধিকা হতেই শ্রীগোবিন্দের আনন্দস্বরূপ রসস্বরূপ, লীলাপুরুষোত্তম, ভক্তবৎসল এবং অসমোর্দ্ধমাধুর্যময় রূপরাশি প্রকটিত হয়ে ওঠে। গোবিন্দ-লীলামৃতে আছে—"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ/অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥" মদন বিশ্বকে বিমোহিত করেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি সেই মদনকেই চমৎকৃত করে আত্মহারা করে দেয়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন 'অখণ্ডরসস্বরূপ', শ্রীরাধাও তেমনি 'অখণ্ডরসবল্লভা'। তিনি ভগবানের অনপায়িনী মহাশক্তিরূপা।

পরম স্বতন্ত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। একমাত্র শ্রীরাধার প্রেম তাঁকে অভিভূত করে রাসরজনীতে প্রেমশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করেছে। লঘুভাগবতামৃতে আছে শ্রীকৃষ্ণ

ঘোষণা করেছেন—"ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী/তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥" 'আমার রাধিকা'—বলে ভগবান্ সাদরে স্বীকার করেছেন এবং ত্রিলোকের অপূর্ব সৃষ্টি বলে শ্রীরাধার মহিমা ঘোষণা করেছেন।

৩

"প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।" (মধ্য/৮)

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীরূপা স্বরূপশক্তির পরম পরিণতি প্রেমে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের ইচ্ছাকেই প্রেম বলে। এই প্রেম ভক্তিবিভূষিত হয়ে উৎকর্ষলাভ ক'রে স্নেহ, মান, প্রণয়রূপে পরিণতিলাভ করে। এই প্রণয় আবার উৎকর্ষ লাভ ক'রে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাতে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার আশায় সকল দুঃখবেদনাকে সুখ বলেই প্রতীত হয়। এই পরিণতিকে 'রাগ' উপাধি দেওয়া হয়। এই রাগ যখন আরও উৎকর্ষলাভ করে—তখন প্রিয়জনের সঙ্গে নিত্য অবস্থান করেও প্রতিমুহূর্তে নূতন বলে প্রতীতী হয়। একে অনুরাগ বলে। "সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্/রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥" এই অনুরাগের চরম পরিণতির নাম 'ভাব'। এই ভাবের পরবর্তী ঊর্ধ্বতর স্তর হলো 'মহাভাব'। মহাভাবকে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ বলেছে—'বরামৃতস্বরূপশ্রী'—অর্থাৎ অনির্বচনীয় মাধুর্যই যার সম্পত্তি। মহাভাব দুই প্রকার—'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়'। রূঢ় মহাভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববশত সদাই অনিষ্টের আশঙ্কা। অধিরূঢ় মহাভাবে—এই সাত্ত্বিক ভাবের আরও অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা।

অধিরূঢ় মহাভাব—দ্বিবিধ। "সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন'—নাম তার।" মাদন আখ্যাপ্রাপ্ত শ্রীরাধার অন্তরের আনন্দ সারা জগৎকে আনন্দে নিমগ্ন রাখে—"মাদয়তি, হর্ষয়তি, সর্বং জগদপি।" 'মোহন' নামক মহাভাবে শ্রীরাধার বিরহকাতরতা। মোহন-আখ্যাপ্রাপ্ত মহাভাব কোন অনির্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত হয়ে ভ্রমসদৃশ বৈচিত্রীময় দশা প্রাপ্ত হলে তাকে 'দিব্যোন্মাদ' বলে। দিব্যোন্মাদ প্রেমেরই গাঢ়তম অবস্থা। তার বাচনিক বিকাশকে 'চিত্রজল্প' আখ্যা দেওয়া হয়।

৪

"সখী বিনু এই লীলার পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥" (মধ্য/৮)

সখী হলেন তাঁরাই—বয়স্যভাববশতঃ পরস্পরের হৃদয় যাঁরা জানেন। লঘুভাগবতামৃতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "মন্মাহাত্ম্যং মৎসপার্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্'—তাঁর মহিমা, সেবা, স্পৃহার বিষয়, মনোগতভাব—একমাত্র সখীগণ জ্ঞাত আছেন। তাঁদের অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ অভিভূত।

শ্রীরাধিকা প্রেমকল্পলতাসদৃশ আর অন্যান্য সখীগণ তাঁর শাখাপত্রতুল্য। "রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা/সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা॥" (মধ্য/৮) শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান ব্যতীত অন্য কোন অনুসন্ধান তাঁদের নেই। 'ইষ্ট সমীহিত' দেহসজ্জা ভগবানের সুখবিধানের একটি সাধনমাত্র। 'স্বসুখতাৎপর্যযুক্ত সম্ভোগেচ্ছা'—তাঁদের নেই। ভগবানের চরণে তাঁদের স্বার্থহীন সান্দ্ৰারতি এবং গাঢ় আবেশ। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তাঁদের মনপ্রাণ তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত। ভগবানকে লাভ করবার জন্য সব ত্যাগ কররার সামর্থ্য ব্রজের সখীরা অর্জন করেছেন বলে তাঁদের রতিকে বলে 'সমর্থা রতি।'

একের অপরের জন্য আনন্দের সঙ্গে আত্মত্যাগ সখীদের প্রীতিকে মহিমান্বিত করে তোলে। "সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন/কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥" (মধ্য/৮) তাঁদের আত্মহৃদিস্থিত কার্য হলো পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা। 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' নয় বলে, একান্তভাবে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদিত বলে সখীদের এই রতি ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন 'কেবলা মধুরারতি।'

সখীদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—সখী ও মঞ্জরী। ললিতা বিশাখা আদি—কায়, মন এবং বাক্যে গোবিন্দের প্রীতিবিধায়িনী সেবায় তৎপর। তাঁরা সখী। মঞ্জরীরা অল্পবয়স্কা কিশোরী। অঙ্গদ্বারা সেবায় তাঁরা প্রস্তুত নন। শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনে সেবার আনুকূল্যবিধান করে থাকেন।

হৃদয়ের আকর্ষণে সখীদের মতো আত্মত্যাগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেও করতে পারেন নি। তাই তিনি সখীদের নিকট চিরঋণ স্বীকার করে বলেছেন—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যামাঽভজন্‌দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"

৫

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়াসাম্যে তার কহে কাম নাম॥" (মধ্য/৮)

অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে গোপিকারা রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলায় বৈচিত্রী সম্পাদন করে থাকেন। এই লীলা প্রাকৃত জগতের কামনার পর্যায়ে পড়ে না। কামনার তাৎপর্য আপন ইন্দ্রিয়ের সুখবিধান। গোপীপ্রেমের তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির টানে গোপীরা বেদধর্ম, পরিজন, আত্মীয়স্বজন পিছনে ফেলে এসেছেন। লোকসমাজের কলঙ্ক, নিজেদের অবমাননার দুঃখ অম্লানবদনে সহ্য করেছেন।

'সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।' পরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবার যত কিছু নিদর্শন পৃথিবীতে আছে—ব্রজের গোপীরা তাকে অতিক্রম করে এক মহান্ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য সকল আত্মসুখ তাঁরা বিসর্জন দিয়েছেন। পরন্তু আপন সহচরীদের সুখের নিমিত্ত তাঁরা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। এক সখী অপর এক সখীকে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ করে দিতে এবং তার জন্য নিজেকে বঞ্চিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না।

শুদ্ধ অনুরাগে সখীরা যে আপন দেহসজ্জা করেন—তাও নিজের আনন্দের জন্য নয়। আনন্দের যিনি আশ্রয় সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করার একান্ত ইচ্ছায়। তাঁদের তনু শ্রীকৃষ্ণচরণে অঞ্জলিপ্রদত্ত। তাঁদের নিজের বলতে কিছুই রাখা নেই। যেটুকু রাখা আছে—সেটুকু হলো শুধু শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি। গোপীদের মনোগতি এই সুরে বাঁধা আছে বলে তাঁদের "বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম।" কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ/লোহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥" (আদি/৪) বৈষ্ণব সাধনায় এইভাবে শুধু গোপীপ্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয় নি, গোপীভাবে সাধনা পরম বরণীয় বিবেচিত হয়েছে।

৬

"রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছে অবতার॥" (মধ্য/৮)

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে অনুপমভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। প্রেমভক্তির বিষয় ভগবান্ স্বয়ং। তার আশ্রয়—'শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলিতচিত্ত' ভক্তের হৃদয়। 'আপন মাধুর্যপানে হইয়া সতৃষ্ণ'—ভগবান্ স্বরূপ পরিবর্তন করে ভক্ত হতে চাইলেন। 'আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন।' কিন্তু 'ভক্তভাব বিনা তাহা নহে আস্বাদন'। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন—"ভক্ত প্রেমের যে দশা যে গতি প্রকার/যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার॥" (অন্ত্য/১৮) এই সব কিছু আস্বাদন করার মানসে সেবামাহাত্ম্যে সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার গৌরকান্তি এবং প্রেমের চরমোৎকর্ষ অবস্থা মাদনাখ্য মহাভাব—এই দুই বস্তুর মিলিত বিগ্রহ হয়ে প্রকটিত হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। মহাপ্রভু হয়ে উঠলেন—'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত'।

ব্রজস্মৃতির উদ্দীপক বিষয়াদি ভক্তপারিষদবর্গের সঙ্গে আস্বাদন করেছেন মহাপ্রভু। নীলাচলে নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখমাধুর্য পান করে নিজরসই আস্বাদন করেছেন। গরুড় স্তম্ভের কাছে একটি জলধারা আছে—"সে খাল ভরিল অশ্রুজলে।" কুরুক্ষেত্রে গ্রহণ স্নানের দিনে শ্রীকৃষ্ণকে কাতর অনুনয় জানিয়েছেন শ্রীরাধা—ব্রজে ফিরে আসবার জন্য। রথযাত্রার কালে মহাপ্রভুর আর্তি অনুরূপ করুণা ঘন ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করেছে। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে সখীরা 'তুলসী, মালতী, যূথী, মাধবী, মল্লিকে'—এই সকল পুষ্পশাখাকে ভগবানের গতিপথ জিজ্ঞাসা করেছিল। বিরহের উৎকণ্ঠায় জগন্নাথদেবের উপবনে মহাপ্রভুর মধ্যে ফুটে উঠতো একই আকুতি। কৃষ্ণবিরহে রাধিকা উদ্ধবের কাছে ব্যাকুল হয়ে ভগবানের সংবাদ জিজ্ঞাসা করতেন। মহাপ্রভুও যেন ঠিক তেমনি-ভাবে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দের কাছে আপন অন্তরের বেদনাকে উজাড় করে ঢেলে দিতেন। গম্ভীরার ভিতর অঘোরচৈতন্য অবস্থায় বিরহের আর্তিতে মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তাঁর। ভক্তচিত্তের স্বরূপ উপলব্ধির পরম চরিতার্থতা ঘটেছে এইভাবে। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে 'স্বভক্তিশ্রী'—আস্বাদন করেছেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

৭

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্ ।।" (শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্)

এই শ্লোকে পরতত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ করে প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের 'বিকার'—তথা ঘনীভূত অবস্থা। তাঁর নাম হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা এবং সেই শক্তির অধিকারী শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা। কিন্তু একাত্মা হয়েও লীলার নিমিত্ত তাঁরা অনাদিকাল থেকে 'গোলকে' পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। কলিযুগে সেই দুই দেহ একত্বপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীচৈতন্যনামে প্রকট হয়েছেন। এই রাধা-ভাব-কান্তি যুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ তথা শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন এমন কোনও রসবিশেষ তাঁর নিজস্বরূপে আছে—যা শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার না করলে তিনি আস্বাদন করতে পারেন না। সেই রসবিশেষ আস্বাদনের নিমিত্ত রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব ও শ্রীরাধার উজ্জ্বল গৌরকান্তি গ্রহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনকে শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত করে, নিজের শ্যামকান্তির পরিবর্তে শ্রীরাধার গৌরকান্তি ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হলেন।

৮

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা—
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ।।" (শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্)

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারের মূল হেতু বর্ণিত হয়েছে। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ—"বাঞ্ছাভরি আস্বাদিল রসের নির্যাস।" তথাপি তিনটি বাঞ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। শ্রীরাধার 'প্রেমমাহাত্ম্য' কীরূপ। সেই শ্রীরাধিকার প্রেমের দ্বারা আস্বাদিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য—সেই 'শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য' কীরূপ। সেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য

আস্বাদন করে শ্রীরাধার সুখতন্ময় মনের যে অবস্থা হয়—সেই 'সুখস্মৃতিময় মনে'র অবস্থাটি কীরূপ।

যাঁর প্রতি প্রেম নিবেদিত হয় তিনি হলেন প্রেমের 'বিষয়'। যিনি প্রেম নিবেদন করেন—তিনি হলেন প্রেমের 'আশ্রয়'। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন প্রেমের বিষয়রূপে প্রেম সেবা পেয়ে যে সুখ—তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু প্রেমের আশ্রয়রূপে পরিপাটি প্রেমসেবা করে যে সুখ—তা তো তিনি জানেন না। এই তাঁর প্রথম বাঞ্ছা।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের সৌন্দর্যের মনোহারিত্ব দেখে চিন্তা করলেন—যে মাধুর্য অন্তহীন তাকে পূর্ণতমরূপে একলা শ্রীরাধা সম্যকরূপে আস্বাদন করেন। শ্রীরাধার পরাৎপর, শ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুটি হচ্ছে 'মাদনাখ্য মহাভাব।' শ্রীকৃষ্ণ এই মহাভাবের অধিকারী হতে চাইলেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় বাঞ্ছা।

আত্মসুখলেশহীন দৃঢ় অনুরাগ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করে অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি শ্রীরাধা লাভ করেন। সেই 'অনুভূতি' উপলব্ধি করার কৌতূহল হলো শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীহরি এই তিনটি বাসনা হৃদয়ে পোষণ করে অবতীর্ণ হলেন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে।

৯

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥"

('বিদগ্ধমাধব'—শ্রীরূপগোস্বামী)

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'—গ্রন্থ রচনার সূচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরূপ গোস্বামীর এই শ্লোক উদ্ধৃত করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। 'সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ।' এটি গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।

শ্লোকটিতে বলা হয়েছে বহুকাল পর্যন্ত ভগবানের উন্নত উজ্জ্বল রসময় ভক্তি-সম্পত্তি দান করা হয় নি। তাই কলিযুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েছেন। স্বর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর দ্যুতির দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন হরি সর্বদা সকলের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হোন। বহুপূর্বে ব্রজলীলায় ভগবান এই প্রেমরূপ ভক্তি দান করেছিলেন বটে—কিন্তু কালপ্রবাহে তা লুপ্তপ্রায় হয়েছিল।

মহাপ্রভুকে 'শচীনন্দন' এই মাতৃনামে অভিহিত করে 'হরি'—বলা হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—"হরিশব্দে বহু অর্থ দুই মুখ্যতম/সর্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন ॥" (মধ্য/২৪) শ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবের মনকে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের দিকে

আকৃষ্ট করেছেন। নিজে প্রেমভক্তি দান করে সকলের মনোহরণ করেছেন। তাতেই সকলের অমঙ্গল নাশ এবং পরম মঙ্গলের উদয়।

মমতা-বুদ্ধিতে এবং সেবার উৎকর্ষে ব্রজের গোপীদের আরাধনা আত্মসুখ-লেশহীন। তাঁদের কৃষ্ণসুখের তাৎপর্যময় লীলায় সিদ্ধ মধুর রসই উন্নত এবং উজ্জ্বল। সেই মধুর রসই হলো স্বভক্তি তথা ভগবানের নিজবিষয়ক ভক্তিসম্পত্তি। সেই ভক্তিরূপ সম্পত্তি শ্রীমন্ মহাপ্রভু পরম করুণাভরে আপামর জনসাধারণকে বিতরণ করলেন।

১০

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তুতে ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ্।।" (আদি/৪)

নির্বিশেষ ব্রহ্ম হলেন নিরাকার। আবার তাঁর আপন শক্তির কার্যকারিতায় আকারলাভ করেন। সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, আস্বাদনবৈচিত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন।

ব্রহ্ম তথা বিরাটবস্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। তিনি ঐশ্বর্য, রূপ, তেজ, সর্বজ্ঞতা, ভক্তবাৎসল্যের আধার। শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীরূপা শক্তি। এই হ্লাদিনী সর্বশক্তিগরীয়সী। তাই শ্রীরাধিকা হলেন পূর্ণশক্তি।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কখনও ব্যবধান নেই। "রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি/অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।" (আদি/৪) শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনীরূপা শক্তির ঘনীভূতা বিগ্রহা হয়ে শ্রীরাধা মূর্ত হয়ে ওঠেন। শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করান। একই স্বরূপ হয়েও অনাদিকাল থেকে তাঁরা দুই স্বরূপে বিরাজিত। "রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ/লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।" (আদি/৪) কস্তুরীতে ও তার গন্ধে যেমন ভেদ নেই—অগ্নিতে ও তার দাহিকাশক্তিতে যেমন ভেদ নেই—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ চিরন্তন এক।

সবিশেষ অর্থাৎ সশক্তিক আনন্দময় লীলায় শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ আছে বলে মনে হয়। আবার নির্বিশেষ আনন্দময় ব্রহ্মে উভয়ে অভেদ বলে মনে হয়। আবার এই ভেদ ও অভেদের 'যোগপত্য' আছে বলেও মনে হয়। তাই এই অচিন্ত্যজ্ঞানকে বৈষ্ণব আচার্যগণ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'—বলে স্বীকার করেন।

১১

"এই ত সাধন ভক্তি দুই ত প্রকার
এক বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর ॥" (মধ্য/২২)

বৈষ্ণব সাধনায় শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই সর্বস্ব। সমস্ত বিধির সারবিধি এইটিই। মহাপ্রভু চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তিসাধনার কথা বলেছেন।

বৈধীভক্তি হলো কেবলমাত্র শাস্ত্রানুশাসনের ভয়ে যে ভক্তির অনুষ্ঠান। কর্মফল থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ঈশ্বরের অপরিসীম ঐশ্বর্যের নিকট কৃপা প্রার্থনা করা। দেহ মন প্রাণ ভগবানে তদ্গতচিত্ত করে—"শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পূজন বন্দন" এবং জপ, স্তবপাঠ, পরিক্রমা, কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী তুলসীমূলে জলসেচন, কার্তিকাদিব্রত, পঞ্চপ্রদীপের আলোয় সজল শঙ্খাদি দ্বারা শ্রীহরির আরতি—বৈধীভক্তির অন্তর্গত।' বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানকারী পরিমিত ভোজন করেন, অপ্রমত্ত, পরদুঃখকাতর, দুষ্কর কার্য একনিষ্ঠ হয়ে তৎপরতার সঙ্গে সম্পাদন প্রয়াসী। "মিত ভুক অপ্রমত্ত মানদ অমানী/গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী ॥" বৈধীভক্তির সাধক জানেন—"নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়"—এবং তা থেকেই "চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥"

রাগানুগ ভক্তি হলো ভগবানে প্রেমময়ী, রাগময়ী তৃষ্ণা ও পরম আবিষ্টতা। শাস্ত্র-শাসনের ভয় থেকে নয়—প্রাণের টানে—ভগবানে ঐশ্বর্য ও গৌরববুদ্ধি অপসারিত। ব্রজে সুবল, যশোমতী, শ্রীরাধিকা—এই সকল স্বরূপশক্তি কর্তৃক যে সেবা তা হলো রাগাত্মক সেবা। জীব স্বরূপশক্তি নয় বলে সখা সুবল, মাতা যশোমতী, কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকা—আদির অনুগত হয়ে কৃষ্ণসেবা করতে হয়। এই আনুগত্যময়ী সেবাকেই 'রাগানুগা' ভক্তির দ্বারা সেবা বলে। সনাতন-শিক্ষায় মহাপ্রভু বলেছেন—"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিগণে/তার অনুগত ভক্তের 'রাগানুগা' নামে।" (মধ্য/২২)

১২

"প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর
রায় কহে—প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য সার ।" (মধ্য/৮)

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের কথোপকথনে ভক্তিসিদ্ধান্তসুধা মথিত হয়ে উঠেছে।

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন সাধ্যবস্তুর সংকেত। ভগবানকে লাভ করার জন্য

যে উপায় অবলম্বন করা হয় তাকেই বলে 'সাধ্য'। রামানন্দ বললেন—"স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়'। স্বধর্মের আচরণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারটি আশ্রমকে স্বীকার করা।

এটি সকাম সাধনার পথ বলে প্রভু একে বাইরের প্রসঙ্গ বলেন। তখন রামানন্দ বললেন কৃষ্ণে কর্ম অর্পণই সাধ্যের সার বস্তু। প্রভু একেও বললেন বাইরের কথা। কৃষ্ণে কর্ম অর্পণ—কর্মজাত বন্ধন থেকে নিবৃত্তি পাবার উপায়। কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির সাধন নয়। তখন রামানন্দ বললেন 'স্বধর্মত্যাগের' কথা। শ্রীমৎভাগবত গীতায় আছে—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

স্বধর্মত্যাগের প্রসঙ্গকেও প্রভু বাইরের কথা বললেন। শুদ্ধাভক্তিমার্গে কর্মত্যাগের বিধি থাকলেও তার একটা অধিকার ব্যবস্থা আছে। যতদিন না ভগবানের স্মৃতিতে, তাঁর নাম গুণগানে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধার উদয় হয় ততদিন কর্ম অবলম্বন করেই থাকতে হয়। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।" তখন রামানন্দ বললেন—জ্ঞানমিশ্রাভক্তির কথা। জ্ঞানের প্রসঙ্গে আসে ভগবদ্‌তত্ত্বের জ্ঞান, জীবস্বরূপের জ্ঞান, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। ভক্তিঅঙ্গের সাধনের প্রারম্ভে এই জ্ঞান মিশ্রিত থাকলে তাকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলে। তারপর সাধন করতে করতে যখন ভক্তির বাবিধারায় জ্ঞানপর্বত ডুবে যায় তখন পরাভক্তি বা প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে সাধক উত্তীর্ণ হন।

জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকেও প্রভু বাইরের কথা বললেন। এখানে ভগবানের সেবাবাসনা অপেক্ষা মোক্ষসাধনাই প্রধান হয়ে ওঠে। তখন রামানন্দ বলেন—'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি'-র কথা। যিনি শাস্ত্ররচনা করেন নি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার সুযোগ পান নি, 'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ' শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আরাধনাও সাদরে গ্রহণ করবেন। মহাপ্রভু এই প্রথম বললেন—'এহো হয়।' মহাপ্রভুর সম্মতিসূচক তৃপ্তির ইশারা পেয়ে রামানন্দ বললেন—"প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য সার।" প্রেমরূপা সেবা বাসনার সঙ্গে একান্ত নিষ্ঠায় যে শ্রীকৃষ্ণসেবা তাই প্রেমভক্তি। 'হৃদয়কর্ণরসায়ণ হরিকথা'—শ্রবণে চিত্তবৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখী হয়। 'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি' জন্মকোটিসুকৃতিতেও লাভ করা যায় না। অথচ ভগবান চিরদিন প্রীতিমিশ্রিত ভক্তির বাঁধনে বাঁধা।

১৩

"প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর
রায় কহে—দাস্যপ্রেম সর্ব সাধ্যসার।" (মধ্য/৮)

প্রেমভক্তির উল্লেখের পর মহাপ্রভু আরও অগ্রসর হতে বলেন। রামানন্দের স্তরপরম্পরার আলোচনায় অধ্যায়ের পর অধ্যায় উন্মোচিত হয়ে চলেছে। ভাবের আবর্তসংঘাতে রয়েছে নাটকীয় গতি। লক্ষ্যপথের অন্তিম পরিণতির জন্য মহাপ্রভুর অন্তরে জেগে উঠেছে উৎকণ্ঠা। তখন রামানন্দ বলেন—'দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার।' আর্তবন্ধু ভগবান প্রভু এবং ভক্ত তাঁর সেবা করবার সুযোগ্য অধিকারী। এই ভাবই হলো দাস্যপ্রেম।

অপরকে সেবা করবার বাসনা জীবের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। যাকে ভালবাসে তার সেবার জন্য চেতনে অচেতনে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী হয়।

ভক্তের কাছে ভগবানই প্রভু। তিনিই সেব্য। তিনিই আরাধ্য। তাঁর প্রীতির নিমিত্ত, সুখের জন্য মনপ্রাণ ঢেলে সেবা করতে ভক্ত আগ্রহী। তাঁকে সেবা করার সৌভাগ্যলাভে সকলে আনন্দিতচিত্ত হয়ে ওঠে। জীবের মমত্ববুদ্ধি ভগবানকে যত্ন করার প্রয়াসে উদ্বোধিত হয়। 'আমি ভগবানের'—এই ভাবের আবিষ্টতায় ভক্তচিত্ত উল্লসিত হয়ে ওঠে। দাস্যপ্রেমের উৎকর্ষময় বিশেষত্ব হলো এটি আত্মসুখশূন্য এবং স্বার্থলেশহীন। ভগবানের প্রেমবশ্যতার মূর্তি আনুগত্যময় সেবার দ্বারা প্রকটিত করে তুলতে চান ভক্ত। দাস্যপ্রীতি বিশ্বাস, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধার মাধুর্যে পরিপূর্ণ। তাই এইরূপ আরাধনা 'প্রীতিরসের কাঙাল'—ভগবানকে ভক্তপরাধীন করে তোলে।

১৪

"প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার।" (মধ্য/৮)

সখা হলেন তাঁরাই, যাঁরা অনুরাগের বশে শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের তুল্য বলে মনে করেন। কোন মতেই ভগবানকে নিজেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইকথা ভেবে বিচলিত হন না। তাঁদের বিশ্বাসপূর্ণ রীতিকে বলে সখ্যপ্রেম। এতে আছে শান্তের একনিষ্ঠতা, দাস্যের সেবা—অধিকন্তু ভক্তের আকুতি ভগবান প্রীতির সঙ্গে

স্বীকার করবেন এই বিশ্বাস। মমতাবুদ্ধি এখানে উৎকর্ষলাভ করে। গৌরব এবং সম্ভ্রম কোন সঙ্কোচের বাধা নিয়ে আসে না।

খেলায় বাজী রেখে শ্রীকৃষ্ণ হেরে গেলে অন্যান্য সখাদের কাঁধে করে বহন করতে হয়। সখারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাযত্ন করেন। দরকার হলে শ্রীকৃষ্ণও সখাদের ক্রটীহীন পরিচর্যা করেন। কে বিভু কে অণু এখানে তার ভেদরেখা লুপ্ত। আনন্দের আতিশয্যে ভগবানের স্বরূপজ্ঞান অপনোদিত। সখাদের কাঁধে করে বহন করবার সময় অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিকর্তা তাঁর শ্রীঅঙ্গে, সখাদের পদযুগল এসে লাগে। তাতে কিছু যায় আসে না। শুদ্ধ মাধুর্যের এমনই বৈচিত্রী। "কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ/কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥" (মধ্য/১৯) স্বচ্ছন্দ খেলাধূলা সুচারু এবং মনোহর হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রসন্নতা লাভ করেন।

জ্ঞানমার্গের সাধকগণ এই সখ্যপ্রেমের লীলায় আসতে পারেন না। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন। দাস্যভাবের ভক্তগণও ভগবানের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠতে পারেন না। সম্ভ্রমের সংকোচ থেকেই যায়। এমনকি ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে কৃষ্ণসখা অর্জুনের প্রীতি 'ঐশ্বর্যাত্মিকা' হয়ে উঠেছিল। একমাত্র ব্রজে সুবল, মধুমঙ্গল আদি শুদ্ধপ্রীতির অধিকারী সখ্যভাবের পরিকরদের সখ্যরতি, চিরদিন 'মাধুর্যাত্মিকা' হয়ে বিরাজ করেছে।

১৫

'প্রভু কহে এহোত্তম, আগে কহ আর
রায় কহে বাৎসলাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।" (মধ্য/৮)

সখ্যপ্রেমের পর আরও অগ্রসর হতে বললে রামানন্দ বললেন—বাৎসল্যপ্রেমের মাধুর্যের কথা। মাতা পিতা গুরুজনরূপে যাঁরা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপালক বলে মনে করেন তাঁদের রতিকে বাৎসল্যপ্রেম বলে। তাঁদের মাধুর্যময় সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্নেহ এবং অনুগ্রহের পাত্র। শ্রীকৃষ্ণ খেলাচ্ছলে পিতা নন্দরাজার পাদুকা পর্যন্ত মাথায় করে বহন করেছেন। বাৎসল্যে শান্ত দাস্য সখ্যের নিষ্ঠা আছে, পালনরূপ মমতাময় সেবা আছে, অসংকোচ ভাব বজায় আছে। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকে অসহায় নাবালক এবং নিজেদের তাঁর রক্ষাকর্তা এই প্রীতিময় অনুভূতি আছে। "আপনাকে পালক জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান/চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥" (মধ্য/১৯) সেবাবাসনার আধিক্যে সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যভাব উৎকর্ষমণ্ডিত।

ব্রজের শুদ্ধ বাৎসল্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান অতলে ডুবে গেছে। তার বদলে জেগে উঠেছে একান্ত আপনজনের আকুতিময় ভাব। যিনি

অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর তিনি আজ লীলার মাধুর্যে স্নেহের কাঙাল। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের পালনকর্তা, সর্বাশ্রয়, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপক বিভুতত্ত্ব—পরমব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান। তিনি মাতৃস্নেহের অপার করুণার বশীভূত হয়ে ক্ষীর নবনীত মাখন চুরি করে ঔদ্ধত্যের জন্য যশোমতীর উদূখলের বন্ধন স্বীকার করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সকলের মুক্তিদাতা—বাৎসল্যের মাধুর্যে সেকথা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল। পরমাভক্তি শুদ্ধপ্রীতি লীলামণ্ডিত হয়ে উঠলো।

১৬

"প্রভু কহে এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার॥" (মধ্য/৮)

শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের প্রাণবল্লভ আর নিজেদের শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদিত কান্তা মনে করে—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই যে দেহ মন প্রাণকে অর্ঘ্যরূপে দান—তাকে কান্তাপ্রেম বলে। বাৎসল্যপ্রেম—স্নেহ, মান, রাগ, অনুরাগ পর্যন্ত উৎকর্ষলাভ করে। তার উর্ধ্বের স্তর ভাব এবং মহাভাব পর্যন্ত উত্তীর্ণ হতে পারে একমাত্র কান্তাপ্রেম।

কান্তা প্রেমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের মমতাধিক্য তো আছেই। অধিকন্তু নিজ অঙ্গ নিবেদন করে সেবা আছে। "আত্মসুখদুঃখ গোপী না করে বিচার।" চির আদরের কুলধর্ম ত্যাগ করে আত্মীয় স্বজনের সকল লাঞ্ছনা এবং দুর্গতি সহ্য করেছে গোপিকারা। তাদের একান্ত লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান। সেবা বাসনায় পরম এবং চরম প্রান্ত পর্যন্ত বিকশিত হতে পারে বলে—কান্তা-প্রেমের ত্যাগ ও আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের সমাহারে পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। তেমনি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চগুণের সমাহারে কান্তাপ্রেম অপরূপ উৎকর্ষমণ্ডিত। "এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার/ অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥" (মধ্য/১৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন তাঁর প্রিয়তমা গোপীদের আত্মবিস্মৃত ভালবাসা তাঁকে অভিভূত করেছে। "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে/এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥" (মধ্য/৮)

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সকল সৌন্দর্যের, সকল মাধুর্যের অবধি তথা প্রান্ত। তা আর বৃদ্ধি পাবার অবকাশ নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন অনতি-শ্যামল মরকত মণি হয়ে মুক্তামালার ন্যায় সজ্জিত চম্পকবর্ণা গোপীদের মধ্যে বিরাজ করেন, তখন তাঁর মাধুর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই 'স্বধর্মের বৈপরীত্যজনিত বৈচিত্রী' কান্তাপ্রেমের সাধনায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। সাক্ষাৎ-মন্মথ-মোহন রূপেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের চরম বিকাশ। কান্তাভাবের সাধনাতেই তা প্রকটিত হয়ে ওঠে।

১৭

"না সো রমণ না হাম রমণী।

দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥" (মধ্য/৮)

কান্তাপ্রেমের মহিমা শ্রবণ করে মহাপ্রভু রামানন্দকে বললেন—"শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব'। রামানন্দ বললেন 'প্রেমবিলাস বিবর্তে'-র কথা। 'প্রেমবিলাস বিবর্ত' অর্থে প্রেমের পরিপক্কতা ও চরম উৎকর্ষ অবস্থা। এর দুটি লক্ষণ—একটি 'বৈপরীত্য' ও আর একটি 'ভ্রান্তি'।

বিলাসের তন্ময়তায় নায়ক নায়িকার স্মৃতি থাকে শুধু 'মনোভব'—অর্থাৎ পরস্পরের প্রীতিবিধানের বাসনা। 'তদ্দ্বয়ৈক্যমাপ্তম্' অবস্থায় কে যে নায়ক কে যে নায়িকা, কে যে সেবা করেছে আর কে যে সেবা গ্রহণ করছে, কে যে শিষ্য আর কে যে গুরু—তার সব সীমারেখার চিহ্ন অবলুপ্ত হয়ে গেছে'। নিবিড় আত্মবিস্মৃতিতে নায়ক নায়িকার অজ্ঞাতসারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই মধুময় বৈপরীত্য ও প্রেমময় ভ্রান্তি ঘটে থাকে।

রামানন্দ স্বরচিত একটি গীত গাইলেন। তাতে শ্রীরাধিকা প্রবাসী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে সখীকে বলছেন যে প্রথম দর্শনেই অনুরাগ জন্মেছিল। অনুদিন তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তার আর অবধি তথা প্রান্ত থাকে নি। অন্তরের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রেরণাই তাদের প্রণয়পথের পাথেয় হয়েছিল। বৈপরীত্য ও ভ্রান্তিতে প্রেম হয়ে উঠেছিল বৈচিত্র্যময়। সে প্রেমের পরিপক্কতা বুঝি আজ আর নেই। তাই দূতীর সাহায্য নিতে গিয়ে শ্রীরাধার আক্ষেপেরও অন্ত নেই।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব শ্রীরাধার প্রেমবিলাসের তন্ময়তার কথা শুনে মহাপ্রভু নীরব হলেন। আপন শ্রীহস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করলেন। 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত'-রূপ সাধ্যবস্তুর কথা শুনে তিনি তৃপ্ত হয়েছেন। সাধ্য-বিষয়ে আর প্রশ্ন তিনি করবেন না। "প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়/তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥" (মধ্য/৮)

১৮

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে

রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥' (মধ্য/৮)

এই শ্লোকে রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর মধ্যে মুক্তজীব ও ভক্তজীবের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদী জ্ঞানমার্গের পথে যেখানে

আছে সাযুজ্যমুক্তির চেতনা—সেটি রামানন্দের কাছে স্বাদবৈচিত্র্যহীন তিক্ত নিম্বফল বলে মনে হয়েছে। সেই তিক্ত নিম্বফলের দিকে ঝোঁক বলে কাকপক্ষীকে তাঁর অরসিক বলে মনে হয়। তেমনি শুধুমাত্র জ্ঞানকে আশ্রয় করে নির্বিশেষ ব্রহ্মে—যেখানে রস আছে অথচ রসবৈচিত্রী নেই—সেখানে লীন হয়ে যাওয়ার রুচিকে তাঁর অরসিকের রুচি বলে মনে হয়েছে।

আর যাঁরা ভক্তিমার্গের সাধক—শ্রীকৃষ্ণসেবাবাসনা যাঁদের কাম্য—শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির ঐকান্তিক ইচ্ছায় তাঁরা রসস্বরূপ ভগবানের লীলা অনুভব করতে ব্যাকুল। সেই ভক্তিরসে অভিজ্ঞ, ভক্তরূপ কোকিল পক্ষীকেই তাঁর রসিক বলে মনে হয়েছে। কারণ কৃষ্ণপ্রেমরূপ আম্রমুকুলই কোকিলরূপ ভক্তের কাছে স্বাদু এবং কাম্য। শুষ্কজ্ঞান তথা ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি নিয়ে 'অব্যক্তশক্তিক আনন্দসত্তা'-য় লীন হওয়া নয়। লীলামাধুর্যে পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমৃতপানই তাঁর কাছে পরম কাম্য ও অভিপ্রেত। এই প্রসঙ্গে রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে বললেন—সম্পদ বলতে তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমরূপ সম্পত্তিকেই গণ্য করেন। দুঃখ বলতে তাঁর কাছে কিছুই নেই। শুধু শ্রীকৃষ্ণবিরহই তাঁর কাছে বেদনাদায়ক। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে ভালবাসেন। তাই সেই ভক্তের সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্যই তিনি শ্রেয় বলে মনে করেন। স্মরণ মধুরতম হয় তাঁর কাছে যখন স্মৃতি শ্রীকৃষ্ণচিন্তামণির ধ্যানে বিভোর হয়ে ওঠে। তিনি চান ভগবানকে ঘিরে লীলার বিস্তার।

১৯

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্। (পদ্যাবলী/৭)

এটি মহাপ্রভুর স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের শ্লোক। এতে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এই সংকীর্তন জীবের চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে। সংসাররূপ মহাদাবানলের জ্বালা প্রশমিত করে। ভক্তি বিদ্যারূপ বধূর জীবনসদৃশ। আনন্দরূপ সমুদ্রকে উচ্ছলিত করে। প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন হয়। এ তাই মন আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তিজনক।

ভগবানের নাম গুণগানে জীবের অন্তঃকরণ শুদ্ধ স্বচ্ছ নির্মল হোক। তাতে ভগবানের ছবি প্রতিফলিত হয়ে উঠুক। ভক্তের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিময় হোক। তখন দুর্বাসনাসকল আমাদের আর কষ্ট দিতে পারবে না। নিরবচ্ছিন্নভাবে

বারিধারা পতনের মত শান্তি বর্ষিত হবে। ত্রিতাপজ্বালা দূরীভূত হয়ে দুঃখ নিবৃত্তি ঘটবে।

চন্দ্রকিরণ সম্পাতে কুমুদকুসুম যেমন প্রস্ফুটিত হয় শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনেও তেমনি জীবের হৃদয়ে মঙ্গলমাধুর্য বিকশিত হোক। বিদ্যা তথা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার উপায় যে ভক্তি—সেই ভক্তিকে লাভ করার পথ জানতে পারুক ভক্ত। বধূর যেমন প্রিয়তম বাঞ্ছিত—ভক্তি-বিদ্যার তেমনি কৃষ্ণসংকীর্তন একান্ত কাম্য। সমুদ্রের তরঙ্গরাজির মত সংকীর্তন হৃদয়কে আনন্দে উদ্বেল করুক। রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের পরিপূর্ণ আস্বাদনে প্রসন্নতায় মন ভরে উঠুক।

২০

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি-
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ (পদাবলী/১৯)

এটি শিক্ষাষ্টকের অন্যতম একটি শ্লোক। মহাপ্রভু বলছেন—ভগবান আপন নামের মধ্যে বহুপ্রকারে নিজের সমস্ত শক্তি অর্পণ করেছেন। সেই নামের স্মরণ বিষয়ে সময়সম্বন্ধীয় কোন বাধা নেই। এমন দুর্দৈব যে সেই নামে প্রাণভরা অনুরাগ এলো না।

পরমকরুণ শ্রীভগবান আর্তজীবের প্রতি দয়াময়। তিনি পতিতপাবন। তাঁর স্বরূপ এবং তাঁর নাম উভয়ই চিন্ময়। বেদ উপনিষদ পুরাণে নামের মাহাত্ম্য কীর্তিত। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সৌন্দর্য মাধুর্যাদির পূর্ণতম বিকাশ। তিনি রসস্বরূপ। তাঁর নামও আনন্দের চির উৎসারী। তা সূর্যের মত স্বপ্রকাশ এবং অমানাশক। সেই নামের স্পর্শে ভক্তের চিত্ত হয়ে ওঠে চেতনায় উদ্বোধিত। তাতেই সর্বশুভোদয় এবং সর্বার্থসিদ্ধি।

নম্ ধাতু থেকে 'নাম' শব্দ নিষ্পন্ন। নম্ ধাতুর অর্থ নামানো। ভগবানের নাম তাঁকে ভক্তের নিকট আকৃষ্ট করে আনে। নামের স্মৃতিকে বেষ্টন করে প্রেম মধুর হয়ে বিরাজ করতে থাকে। 'চিত্তশুদ্ধি' ঘটে—'প্রেমভক্তি' লাভ হয়। মহাপ্রভু দৈন্যপ্রকাশ করে বলেছেন, যে নামে 'এতাদৃশী তব কৃপা'—সেই নামে তাঁর অনুরাগ হলো কৈ?

২১

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (পদ্যাবলী/২০)

শ্লোকটি শিক্ষাষ্টকের। নম্রতার আদর্শে তৃণের মত, সহিষ্ণুতার আদর্শে বৃক্ষের মত হয়ে নিজের সুখদুঃখের কথা ভুলে অপরকে শ্রদ্ধা দিয়ে সুখী করবে এবং শ্রীহরির গুণকীর্তন করবে। ভগবানের নামকীর্তনের সময় মনের অবস্থাটা এমনই হওয়া চাই।

ধনে, জনে, কুলে মানে বিদ্যায় ভক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েও ভগবানের নামে সকল মানুষকে কাছে টেনে নিতে হবে। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের আভিজাত্যের প্রাচীর তুলে ব্যবধান সৃষ্টি করলে চলবে না। তবেই প্রেমধর্মের মাধুর্য প্রকটিত হয়ে উঠবে।

সহগুণ থাকা চাই। কাম্যবস্তুকে লাভ করতে হলে সাধনা দরকার। একটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই নীরব অবিচলিতচিত্ততা।

"বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়

শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়।" (অন্ত্য/২০)

লক্ষ্যে পৌছাতে চাই এমনই সাধনা। এই শ্লোকটির অর্থপ্রকাশ কালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।" "উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।" আগে সাধনার দ্বারা নিজেকে উত্তমরূপে গঠন করে নিতে হবে। মহাপ্রভুর নিজের ব্যক্তিত্বটি ছিল তেমনই বলিষ্ঠ। প্রেমধর্মই যে পরম পুরুষার্থ এটি প্রমাণ করতে সারাজীবন তাঁকে নীরব সংগ্রাম করতে হয়েছে। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, শূদ্র, ধনী, দরিদ্র—সকলকে কাছে টেনে নেবার বলিষ্ঠ 'নরবপু' তাঁর ছিল। জলদ-গম্ভীর বজ্রকঠিন মনের অধিকারী হয়েও মহাপ্রভু ছিলেন নিরভিমান।

২২

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ (পদ্যাবলী/৮৫)

এই শ্লোকটি শিক্ষাষ্টকের অন্যতম একটি শ্লোক। মহাপ্রভু ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করে বলছেন—ধন, জন, মনোরম কাব্যরচনাশক্তি তাঁর কাম্য নয়। তাঁর একান্ত প্রার্থনা জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভগবদ ভক্তি।

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থ ছিল ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রে চির অভিপ্রেত। যুগ যুগান্ত ধরে ভারতীয় জীবনধারায় এই চারটি বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়ে এসেছে। মানুষ সাধনা করেছে এইগুলি লাভ করার মানসে। যাগযজ্ঞ, ধর্মানুষ্ঠান—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের কর্মধারা—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই সকল আশ্রমজীবন—সব কিছুর মূলেই ছিল এই চারটি বিষয়।

কিন্তু এগুলির মধ্যে জড়িত হয়ে আছে কামনা এবং আত্মসুখের তাৎপর্য। এই চার পুরুষার্থ অতিক্রম করে মহাপ্রভু শোনালেন পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেমভক্তি'-র কথা। সেটি হবে অহৈতুকী—প্রতিদানলেশহীন। তাই ঐশ্বর্যলেশশূন্য মাধুর্যময় বাৎসল্য, সখ্য, মধুররসের ব্রজলীলাই মহাপ্রভুকে সর্বক্ষণ ভাবতন্ময় করে রেখেছিল। কামনা বাসনার সঙ্গে সংস্পর্শশূন্য শুদ্ধভক্তিই ছিল মহাপ্রভুর একমাত্র কাম্য। তিনি বলেছেন—"শুদ্ধভক্তি দেহ মোবে কৃষ্ণ কৃপা করি।"

২৩

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥" (পদ্যাবলী/১৩)

শিক্ষাষ্টকের এই শ্লোকে মহাপ্রভু বলছেন তিনি ভগবানের দাস। বিষম সংসার সমুদ্রে নিপতিত। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ হতে চান তিনি।

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অভিমান অপহৃত এবং মায়াবদ্ধ সংসারীর জীব অভিমান প্রকটিত। তিনি দৈন্য প্রকাশ করে বলেছেন অনাদিকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যেন মায়িক সুখভোগে আবদ্ধ হয়ে আছেন। ভবার্ণবে তথা সংসার সমুদ্রে সুখ-দুঃখের তরঙ্গ তাড়িত হচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে আছেন।

সদৈন্য ভক্তির রীতি আপনি আচরণ করে জীবকে শিক্ষা দিবার মানসে বলছেন—শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে যেন তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় দেন। তাঁর সেবক হবার সৌভাগ্যদান করেন। বিরহের বেদনায় গোপিকারা বলেছিল "বিরহ সমুদ্রজলে/ কাক-তিমিঙ্গিলে গিলে/গোপীগণে লহ তার পার।" সেই বিরহতন্ময়তা আজ মহাপ্রভুর অন্তরে।

২৪

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।।" (পদ্যাবলী/৮৪)

শিক্ষাষ্টকের এই শ্লোকে মহাপ্রভু বলেছেন—এমন দিন কবে আসবে যখন ভগবানের নাম গ্রহণ করতে দুনয়নে অশ্রুধারা বইবে, বাণী নীরব হয়ে আসবে, সমস্ত দেহ অপার পুলকে পরিব্যাপ্ত হবে।

এখানে মহাপ্রভু 'আপনাকে করে সংসার জীব অভিমান।' তিনি নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করে ঈশ্বর আরাধনার পরম সাধাবস্তু প্রেমভক্তিকে সম্বল করে শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন করেছেন। দৈন্য ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে ভগবানের স্মৃতিবিজড়িত নামের মাধুর্যে আপনার সমস্ত চিত্তকে পরিস্নাত করতে চাইছেন। সমস্তের আশ্রয় যিনি—জীবের সকল দুঃখ যিনি হরণ করে অন্তরকে আনন্দে ভরিয়ে দেন—অশ্রুসিক্ত নয়নে সেই করুণাঘন ভগবানের চরণে আকুতি নিবেদন করতে চান।

কৃষ্ণসেবার উপায়স্বরূপে 'সপ্রেম নামসংকীর্তন'-এর মাহাত্ম্য ঘোষণা করছেন মহাপ্রভু। সংসারে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, শোক-তাপ আছে। বেদনায় জর্জরিত না হয়ে প্রেমময় কৃষ্ণস্মৃতিকে সম্বল করে ভক্ত আনন্দে চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলুক। রসস্বরূপকে লাভ করে চিরন্তনী সুখবাসনার পরমা তৃপ্তি লাভ ঘটুক।

২৫

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।।" (পদ্যাবলী/৩২৭)

কৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু বলছেন—গোবিন্দ-বিরহে এক নিমেষকাল এক যুগের মত দীর্ঘ হয়েছে। দুনয়নে অশ্রু। প্রাণবল্লভের অভাবে সমস্ত জগৎ শূন্যতায় ভরে গেছে।

ভগবানের চিন্তায় মহাপ্রভুর মন নিবিষ্ট। দুই চক্ষু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত বৃন্দাবনের শূন্য কুঞ্জমন্দিরে ঘুরে ফেরে। যিনি একদিন স্নেহ এবং সৌন্দর্যের অমৃত তরঙ্গের হিল্লোলে সকলকে চঞ্চল করেছেন তিনি আজ কত দূরে। প্রেমবিবশ বিরহব্যাকুল মহাপ্রভুর হৃদয় আজ ব্যথিত।

'দলিতাঞ্জন চিক্কণ' নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাঁর দেহকান্তি, বিজলী অপেক্ষাও মনোহর যাঁর বসন, মুরলীশোভিত শ্রীমুখ যাঁর সর্বচিত্তহর—সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনের জন্য বহুকালের পিপাসা নিয়ে মহাপ্রভুর নেত্রচাতক ব্যাকুল। শ্রীকৃষ্ণ—'কৃতপরিহাস' অর্থাৎ পরিহাসপটু। অনঙ্গ-তরঙ্গায়িত দৃষ্টি তাঁর। ভুজযুগল কন্দর্পজ্বালা আনে আবার জীবের দুঃখহারী হয়ে সকল বেদনার নিরসন তিনিই ঘটান। "কৃষ্ণ কর পদতল কোটিচন্দ্র সুশীতল।" শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের স্মৃতি এইভাবে ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে। তাঁর অভাব মহাপ্রভুর হৃদয়কে শূন্যতায় ভরিয়ে দেয়।

২৬

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ (পদ্যাবলী/১৩৪)

শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু বলছেন—শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠালিঙ্গিতবাহু হয়ে আপন বক্ষে স্থান দিন অথবা বিরহে আতুর করে তুলুন, অথবা বহুবল্লভ হয়ে যেখানেই বিহার করুন না কেন—তিনিই তাঁর প্রাণনাথ। তাঁর আর কেউ নেই।

"চিন্তাকাঁথা উঢ়ি গায়"—কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—মহাপ্রভুর শরীরে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহচিন্তার ছায়া পড়েছে। মহাপ্রভুর মনে হয়েছে পিঙ্গলাদাসী যেমন প্রিয়তমকে মন থেকে মুছে ফেলে বিরহযন্ত্রণা ভুলেছিল তিনিও তেমনি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি ত্যাগ করে শান্তি পাবেন। পরমুহূর্তেই তিনি বুঝতে পেরেছেন ভক্ত ও ভগবানের চিরন্তন মিলন কখনও বিচ্ছিন্ন হবার নয়। "যারে চাহি ছাড়িতে—সে শুইয়া আছে চিতে।" শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমের মাধুর্য মহাপ্রভুর জীবনকে ঘিরে এমনি করেই চিরজাগ্রত হয়ে বিরাজ করতে থাকে।

'দিব্যসদ্‌গুণ সাগর'—'রাসবিলাসনাগর'—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীরাধিকা বলেন—'ক সখি জীবরক্ষৌষধি'—তাঁর প্রাণরক্ষার ওষধি কোথায়? কোথায় শিখিপুচ্ছভূষণ, ইন্দ্রনীলমণি, নন্দকুলচন্দ্রমা! 'একবার যার নয়নে লাগে—সদা তার হৃদয়ে জাগে।' সেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মানসে হর্ষ, ঈর্ষ্যা, উদ্বেগ, দৈন্য, আর্তি নিয়ে মহাপ্রভু "রজনী-দিবস-কৃষ্ণবিরহবিহ্বলে।"

'চৈতন্য গোসাঞির যত পারিষদচয়'

এইমত অসংখ্য চৈতন্য ভক্তগণ।
দিঙ্ মাত্র লিখি সম্যক না যায় কথন॥ (আদি/১০)

শ্রীসনাতন : তাঁর পূর্বনাম 'সাকর মল্লিক'। তিনি ছিলেন গৌড়েশ্বর হুশেন শাহের রাজমন্ত্রী। মহাপ্রভু নীলাচল থেকে গৌড়ে আসার সময় রামকেলি গ্রামে এলে শ্রীসনাতন আত্মনিবেদন করেন এবং ভগবৎ সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প জ্ঞাপন করেন। তিনি সংসার ত্যাগ করতে পারেন এই সন্দেহে হুশেন শাহ সনাতনকে কারাগারে বন্দী করেন। সনাতন কৌশলে কারাগার থেকে নিজেকে মুক্ত করে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেন। মহাপ্রভু তখন বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফিরছেন। কাশীতে সনাতনের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। দুমাস আপনার কাছে রেখে মহাপ্রভু সনাতনকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেন। সনাতন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কে আমি, কেনে আমা জারে তাপত্রয়/ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয়।" (মধ্য/২০) মহাপ্রভু জীবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেন—শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনার মধ্যেই জীবের আনন্দের উৎস। তিনি বলেন—"কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিত পাবন।" "কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার।" সনাতনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গেই মহাপ্রভু বলেছিলেন ভগবানেব মানবলীলার মাহাত্ম্যের কথা—"কৃষ্ণের যতেক খেলা/সর্বোত্তম নরলীলা/নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" (মধ্য/২১) মহাপ্রভু সম্বন্ধ তত্ত্বের কথা বলেন। ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ হলো সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। তিনি অভিধেয় তত্ত্বের কথা বলেন। অভিধেয় অর্থাৎ রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করতে হয় সেই উপায়টি হলো অভিধেয়। প্রেমভক্তিই হলো শ্রীকৃষ্ণকে পাবার পরম উপায়। মহাপ্রভু সনাতনকে প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বলেন। যে উদ্দেশ্যে উপাসনা করা হয় তাকেই প্রয়োজন তত্ত্ব বলে। ভগবানের স্মৃতিকে জাগরূক করে রাখাই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাপ্রভু বললেন চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তির কথা; কর্ম, জ্ঞান, ভক্তিযোগের কথা। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা এবং কলিযুগে কৃষ্ণনামসংকীর্তন। গুরু এবং অন্তর্যামীরূপে শ্রীকৃষ্ণ, বৈধীভক্তি, রাগানুগাভক্তি, শুদ্ধভক্তি এবং পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম—এইসকল প্রসঙ্গ মহাপ্রভু সনাতনের নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বললেন "বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিবে" "অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে" "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্য উদ্বেগ না

দিবে।" তিনি আদেশ করেন "তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার/মথুরার লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার।" (মধ্য/২৩) আর মানুষের সেবাব জন্য "কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙাল ভক্তগণ/বৃন্দাবনে আইসে যদি করিহ পালন।" (মধ্য/২৫) বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের মননশীল ভিত্তি রচনায় শ্রীসনাতনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর গ্রন্থরাজির মধ্যে 'হরিভক্তিবিলাস' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরূপগোস্বামী : শ্রীরূপের পূর্বজীবনের পরিচয় হলো 'দবীর খাস'। তিনি ছিলেন গৌড়েশ্বর হুশেন শাহের খাসমুন্সী। তাঁর পিতার নাম কুমারদেব। মহাপ্রভু নীলাচল থেকে গৌড়ে এলে রূপ তাঁর শরণাগত হন। পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাকর মল্লিক তথা সনাতনের জন্য দশ হাজার টাকা এক মুদীর দোকানে জমা রেখে ছোটভাই অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে সংসাব ত্যাগ করেন। মহাপ্রভু তখন বৃন্দাবন ভ্রমণ করে ফিবছেন। পথে প্রযাগে রূপ তাঁব সঙ্গে মিলিত হন। দশদিন নিকট সান্নিধ্যে বেখে মহাপ্রভু রূপকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দান কবেন। যে প্রসঙ্গগুলি মহাপ্রভু উত্থাপন কবেন সেগুলি হলো কর্মনিষ্ঠ, জ্ঞানী, মুক্ত, কৃষ্ণভক্ত জীব—গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে লভ্যভক্তি—ভুক্তিমুক্তিলেশহীন ভগবৎভজনা—নিষিদ্ধাচারের বাহুল্যবর্জন, জীবহিংসা বর্জন, শুদ্ধভক্তি তথা কেবলাভক্তি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস এবং প্রেমের ভাব ও মহাভাবে উত্তরণ।

মহাপ্রভুর অন্তরের ভাবকে কাব্যে রূপ দেবাব দুর্লভ শিল্পদৃষ্টি ছিল রূপের। একটি কাহিনী আছে। মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে ভাবতেন যেন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছেন। কুরুক্ষেত্রে গ্রহণস্নানে এসে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে শ্রীরাধা আকুল হয়ে বলেছিলেন যে এই ঐশ্বর্যময় পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে শ্রীরাধার শূন্য হৃদয় ভরে উঠছে না। তাঁকে বৃন্দাবনে ফিরে আসতে হবে এইটাই শ্রীরাধার একান্ত ইচ্ছা। এই ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টিকারী একটি লৌকিক কাব্যের অংশ মহাপ্রভু অনেকবার ভক্তসমক্ষে বলেছেন—"রেবারোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।" তার অর্থ হলো নায়িকা বলছেন যাঁর সঙ্গে পূর্বপ্রণয় হয়েছিল তাঁর সঙ্গেই বিবাহ হয়েছে। কিন্তু অতীতের সুখস্মৃতিবিজড়িত দিনগুলি তাঁর মনকে বেদনায় ভারাতুর করছে। মহাপ্রভুর অন্তরে বৃন্দাবন এবং কুরুক্ষেত্রের মধ্যে সেই যে ফেলে আসা দিনের বেদনার ব্যবধান—সেই বিষয়টি রূপ অনুধাবন করতে পেরে সুন্দর শ্লোকে শিল্পরূপ দিয়ে লিখলেন—"মনো মে কালিন্দীপুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি"। এই শ্লোক শুনে মহাপ্রভু পরম বিস্ময়ে রূপকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে?" রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে ভক্তির রসরূপে বৈচিত্রীলাভ, চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর গ্রন্থরাজির মধ্যে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীজীবগোস্বামী : রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন অনুপম। শ্রীজীব হলেন অনুপমের পুত্র। তিনি নবদ্বীপে অধ্যয়ন করতে এসে শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন গমন করেন। সেখানে পিতৃব্য রূপ এবং সনাতনের কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাব্য ব্যাকরণ, অলংকার স্মৃতি, দর্শন সকল বিষয়েই তাঁর মনীষা ছিল অসাধারণ। তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখছেন "শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার/ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে লিখিয়াছেন সার।" (মধ্য/১) তাঁর 'গোপালচম্পূ' কাব্যে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। 'মাধবমহোৎসবে' আছে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক। 'ভাগবতসন্দর্ভে' আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ অনুযায়ী ভাগবতের ব্যাখ্যা। "পরমাত্মসন্দর্ভে" আছে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের ভেদ এবং অভেদ নিয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদের কথা। "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে" শ্রীকৃষ্ণকে অংশ অবতার না বলে সর্বরূপে স্বয়ং পূর্ণ 'অবতারী' বলা হয়েছে। 'ভক্তিসন্দর্ভে' শুদ্ধভক্তি, বৈধীভক্তি, রাগানুগাভক্তির প্রসঙ্গ বলেছেন। 'প্রীতিসন্দর্ভে' বলেছেন প্রেমভক্তির প্রসঙ্গ। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে ভগবানের প্রতি উদ্দিষ্ট প্রীতিকে 'প্রেমভক্তি' আখ্যা দেওয়া হয়। ভগবৎপ্রীতিকে 'স্থায়ীভাব' রূপে গ্রহণ করে তিনি দেখিয়েছেন ভক্তি কেমনভাবে রসরূপে পরিণতিলাভ করে। জীবগোস্বামী বৈষ্ণবধর্মের সকল আবেগ এবং আকুতিকে দার্শনিক ভিত্তিভূমির উপর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাদান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমাদের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

রঘুনাথ দাস : তিনি সপ্তগ্রাম নিবাসী শ্রীগোবর্ধন দাসের পুত্র। বাল্যকালে তিনি হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গলাভ করেন—"রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন/হরিদাস ঠাকুরে যাই করয়ে দর্শন॥" (অন্ত্য/৩) সন্ন্যাস গ্রহণ করে মহাপ্রভু শান্তিপুরে এলে রঘুনাথ তাঁর শরণাগত হন। সে সময় মহাপ্রভু রঘুনাথকে সংসারে ফিরে যেতে আদেশ দেন। পাণিহাটীতে নিত্যানন্দপ্রভুর উৎসবে উপস্থিত থাকেন রঘুনাথ দাস। তারপর তিনি নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। প্রভু তাঁকে স্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করেন। দীর্ঘ ষোল বৎসর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করার সৌভাগ্য হয়েছে রঘুনাথ দাসের। মহাপ্রভু রঘুনাথকে 'গুঞ্জামালা' ও 'কৃষ্ণশীলা' দান করেন। রঘুনাথকে তিনি বলেন—"অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে/ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে।" (অন্ত্য/৬) রঘুনাথ দাসের 'দানকেলিচিন্তামণি' গ্রন্থে ছন্দ এবং অলঙ্কারের সঙ্গে আদিরস ও ভক্তিরসের সুন্দর মিলন ঘটেছে। চৈতন্যস্তবে রঘুনাথ দাস লিখেছেন—"গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি" তাঁর হৃদয় মহাপ্রভুর কৃপাপরশে সর্বদা পুলকিত হয়ে আছে। শেষ জীবনে তিনি বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকট বাস করতেন। সেখানে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর নিকট সান্নিধ্য লাভ করেন।

রঘুনাথ ভট্ট : তিনি মহাপ্রভুর ভক্তশিষ্য—তপন মিশ্রের পুত্র। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে মহাপ্রভু বঙ্গদেশ ভ্রমণ করতে গেলে—তপন মিশ্র তাঁর শরণাগত হন। মহাপ্রভু তাঁকে 'ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর' মন্ত্র দান করেন। নামসংকীর্তনের আদর্শ সেখান থেকেই প্রচার শুরু হয়। মহাপ্রভু তাঁকে কাশীধামে থাকতে আদেশ দেন। মহাপ্রভু নীলাচল থেকে বৃন্দাবনে যাবার এবং ফিরবার পথে তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। বালক রঘুনাথের তখনই তাঁকে সেবা করার সৌভাগ্যলাভ হয়—"ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিল শয়ন / মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসংবাহন।" (মধ্য/১৭) তিনি পরে নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর শরণগত হন। প্রথমবার তিনি রঘুনাথকে পিতামাতার সেবার জন্য কাশীতে পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয়বার নীলাচলে এলে তিনি তাঁকে আপন আশ্রয়ে স্থান দেন—"দণ্ডপ্রণাম করিয়া ভট্ট পড়িলা চরণে / প্রভু রঘুনাথ বলি কৈল আলিঙ্গণে।" (অন্ত্য/১৩) জগন্নাথদেবের প্রসাদী তুলসীর মালা তিনি রঘুনাথকে দান করেন। মহাপ্রভু বললেন—"ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম / অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান।" (অন্ত্য/১৩) তিনি বৃন্দাবনে চলে আসেন। সেখানে রূপগোস্বামীর সভায়—"কৃষ্ণের সৌন্দর্যমাধুর্য যবে পড়ে শোনে / প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে।" (অন্ত্য/১৩) আদর্শ যতিজীবন তাঁকে বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধার আসন দান করেছে।

গোপাল ভট্ট : তাঁর নিবাস ছিল দক্ষিণ ভারতে। বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনে তাঁর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ের জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ছয় গোস্বামীর অন্যতম হিসাবে পরিচয় দিয়ে তিনি গোপাল ভট্ট প্রসঙ্গে বলেন—"এই ছয়গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার / ইঁহা সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।" (আদি/১) তিনি আরও বললেন—"শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।" নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে লিখেছেন—গোপাল ভট্ট নীরব সাধনা ভালবাসতেন—কোথাও তিনি নিজেকে প্রচার করতে চান নি—"কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার / নামমাত্র লিখে না করে প্রচার।" চৈতন্যচরিতামৃতে তাই অন্যান্য আচার্য গোস্বামীদের সঙ্গে তাঁর নামটুকু মাত্র গাঁথা হয়ে আছে—"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ / শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।" রূপ ও সনাতনের অপ্রকটের পর তিনি বৃন্দাবনে বৈষ্ণব ভক্তগণের গুরুদেব বলে পূজিত হয়েছেন। বৈষ্ণব সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন—গোপাল ভট্টর শিষ্য।

মাধবেন্দ্রপুরী : চৈতন্যদেবের পূর্বে মাধবেন্দ্রপুরীই অনুরাগপ্রধান কৃষ্ণভক্তির

মহিমা প্রচার করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীগোপালমূর্তি আবিষ্কার করেন এবং তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—"জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর / ভক্তিকল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর।" (আদি/৯) মাধবেন্দ্রপুরী থেকে পরম্পরাক্রমে সকলে প্রেম ও ভক্তি লাভ করে। মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী ছিলেন আবার মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। তাই তিনিই মূল—"পৃথিবীতে রোপন করি গেলা প্রেমাঙ্কুর / সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর।" (অন্ত্য/৮) দেহত্যাগের সময় মাধবেন্দ্রপুরীর কণ্ঠে ছিল শ্রীরাধিকার এই বাণী—"অয়ি দীনদয়াদ্র্র নাথ হে, মথুরানাথ কদাবলোক্যসে / হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"—হে দীনদয়াদ্র্র, হে নাথ, হে মথুরানাথ—কবে তোমার দেখা পাবো? হে দয়িত তোমার অদর্শনে হৃদয় কাতর—কি করি!

শ্রীবাস: তিনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। শ্রীবাসের গৃহেই মহাপ্রভুর অভিষেক হয়েছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে একবৎসর সেখানে মহাপ্রভু আপন গোষ্ঠীকে নিয়ে সংকীর্তন সাধনা করেছেন—"তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর / রাত্রে সংকীর্তন কৈল এক সংবৎসর।" (আদি/১৭) সেখানে সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। মহাপ্রভু সত্যকে প্রথমে নিজে আচরণ করে দেখতে চেয়েছেন। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকে মহাপ্রভু কৃপা করেছিলেন—"উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান।" 'চৈতন্যভাগবত' স্রষ্টা বৃন্দাবন দাস ছিলেন নারায়ণী দেবীর পুত্র।

শ্রীবাসের গৃহে প্রবেশাধিকার না পেয়ে এক বিপ্র মহাপ্রভুকে অভিশাপ দিয়েছিল—"সংসার সুখ তোমার হউক বিনাস।" মহাপ্রভুও তাই চাইছিলেন। অভিশাপ শুনে তিনি সুখী এবং উল্লসিত হলেন। শ্রীবাস তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে মহাপ্রভুর আরাধনা করতেন। তাঁর অঙ্গনে একদিন মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ সংকীর্তন করছেন। গৃহে শ্রীবাসের পুত্রের দেহত্যাগ ঘটেছে। পাছে সংকীর্তনে বিঘ্ন ঘটে তাই অন্তরের ব্যথা গোপন করে সমাপ্তি পর্যন্ত শ্রীবাস নীরব থেকেছেন। এই ঘটনায় করুণহৃদয় মহাপ্রভু বললেন—স্বয়ং তাঁকে এবং নিত্যানন্দকে শ্রীবাস যেন আপন হারানো পুত্রের স্থলাভিষিক্ত করে গ্রহণ করেন। নীলাচলে রথযাত্রার সময় সংকীর্তনের সাতটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি থাকতো শ্রীবাসের সম্প্রদায়।

রায় রামানন্দ: রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীন বিদ্যানগরের রাজকর্মচারী। তিনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ হন। সাধ্যসাধনতত্ত্ব নিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর

দীর্ঘ ভক্তিরসময় আলোচনা হয়। অন্ত্যলীলায়—"রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান / বিরহবেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ।" (অন্ত্য/৬) মহাপ্রভুর অন্তরের ব্যথা অনুধাবন করে ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টিকারী বৈষ্ণব পদ পাঠ করতেন তিনি—"বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীতগোবিন্দ / ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ।" (অন্ত্য/১৭) তাঁর সংস্কৃত নাটক 'জগন্নাথবল্লভ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বরূপদামোদর গোস্বামী: পূর্বনাম পুরুষোত্তম আচার্য। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে অভিমান করে নবদ্বীপ ত্যাগ করে তিনি বারাণসী চলে যান এবং সেখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর ধ্যাননেত্রে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হলেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর চরণে স্বরূপ প্রণত হলে তিনি পরম স্নেহে আলিঙ্গন করে বলেন—"তুমি যে আসিবে আমি স্বপ্নেতে দেখিল / ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল।" (মধ্য/১০) কোন নূতন রচনা মহাপ্রভুকে দেখাবার আগে স্বরূপের অনুমতি নেওয়া হতো—"গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহো প্রভু আগে আনে / স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে।" (মধ্য/১০) মহাপ্রভু—"স্বরূপ গোসাঞিকে কহে—গাও এক গীত / যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত সংবিত।" (অন্ত্য/১৫) তখন……"স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া / ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া।" (অন্ত্য/১৬)

বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য: চৈতন্যদেবের শৈশবকালে সার্বভৌম নবদ্বীপ ছেড়ে নীলাচলে আসেন। মহাপ্রভু নীলাচলে এসে জগন্নাথ দর্শনকালে প্রেমানুভূতিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে সার্বভৌম আপন বাসায় নিয়ে এসে শুশ্রূষা করেন। একসময় সার্বভৌম মহাপ্রভুকে বেদান্ত পাঠ করে শোনাচ্ছেন। সাত দিন পার হয়ে গেছে। মহাপ্রভু কোন মন্তব্য করছেন না দেখে সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করেন—"বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি।" মহাপ্রভু বললেন বেদান্তসূত্র তিনি বুঝতে পারছেন, কিন্তু সার্বভৌমের—"ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল।" তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে সার্বভৌমের 'সম্বন্ধ' 'অভিধেয়' এবং 'প্রয়োজন' তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। মহাপ্রভু ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তির প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেন। মহাপ্রভু সার্বভৌমকে শ্রদ্ধা করে বলেছিলেন—"ষড়দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য সার্বভৌম / ষড়দর্শনে জগদগুরু ভাগবতোত্তম।" (অন্ত্য/৭) চৈতন্যদেবের প্রভাবে সার্বভৌম ভক্তিধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। মহাপ্রভু বলেছিলেন—"প্রভু কহে ভট্টাচার্য না কর বিস্ময় / ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয়।" দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের প্রাক্কালে সার্বভৌম

অনুরোধ করলেন মহাপ্রভুকে—"রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে" "পৃথিবীতে রসিকভক্ত নাহি তাঁর সম"…"আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবা।" গৌরাঙ্গস্তুতি রচনা করে সার্বভৌম লিখলেন—মহাপ্রভুর পদারবিন্দে—'গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।' চিত্তরূপ ভ্রমর মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিবিড়ভাবে অনুরক্ত হোক।

শচীমাতা : শচীমাতার মধ্যে আমরা চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের চিত্র খুঁজে পাই। তাঁর সন্তান-বাৎসল্য জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁকে ঘিরে চৈতন্যদেবের শৈশব কৈশোরের দিনগুলির স্মৃতি জীবনচরিতকারগণ কতরূপে কতবার বর্ণনা করেছেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণকালে তাঁর বিচ্ছেদ-বেদনা জগৎবাসীকে বেদনার্ত করেছে। তিনি লৌকিক জননীর মতোই ভগবানের প্রতি অনুযোগ করে কাতরে বলেছেন—"বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈনু সেবন / তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ॥" (মধ্য/৩) মহাপ্রভুর মাতৃভক্তিও অনুপম। পরম করুণাভরে তিনি বলেন—'কোটিজন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে।' বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে একবার গৌড়ে এসেছিলেন মহাপ্রভু। তখন—'মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল / বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা লইল।" (মধ্য/১৬) নীলাচল থেকে যখন ভক্তেরা গৌড়ে ফিরতেন, তখন তাঁদের হাতে মায়ের জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে বলতেন—"এই বস্ত্র মাতাকে দিও এসব প্রসাদ / দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ॥" (মধ্য/১৫)

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী : বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু তার পরেই পিতৃশ্রাদ্ধকৃত্যের জন্য গয়াধামে এলে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মচিহ্ন দর্শনে তাঁর জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত হয়। অন্তরে উপলব্ধ সত্যকে জগৎ-বাসীর কাছে প্রকাশিত করতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এক বছর শ্রীবাসের অঙ্গনে ভক্তসহিত সংকীর্তন ধ্যান সাধনায় অতিবাহিত হয়। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বা তাঁদের ব্যবহারিক জীবনের পরিচয় জীবনীকাব্যগুলিতে প্রায় আড়ালেই থেকে গেছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুরে অবস্থানকালে বহু ভক্ত সমাগম হয়েছিল। সকলেই তাঁকে দর্শন করতে পেয়েছে। কিন্তু স্ত্রীদর্শন সন্ন্যাসীর নিষিদ্ধ। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে আর শান্তিপুরে আনয়নের প্রসঙ্গ আসে নি। ত্যাগের অশ্রুজলেই নবদ্বীপধামে তাঁর আরাধিত শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মূর্তি'ও মন্দির অক্ষয় কীর্তি হয়ে বিরাজ করছে।

পরিশিষ্ট

চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ

মধ্যযুগে বৈষ্ণবচরিতগ্রন্থগুলি শুধু এক নতুন সাহিত্যধারার পরিচয়বাহী নয়, তার মধ্য দিয়ে মানবমহিমা প্রচারের যে প্রচেষ্টা দেখা গেল তাকে আধুনিক সাহিত্যের সূচনা বলতে পারি। অবশ্য আধুনিক কালে ইতিহাস রচনা বা জীবনী সংকলনের যে পদ্ধতি প্রচলিত, মধ্যযুগে তার নিদর্শন মেলে না। চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থগুলির মধ্যে মহাপ্রভুর অবতারত্ব সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে, আর অবতারলীলা বর্ণনায় ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ তথ্যদৃষ্টি সুলভ বা প্রত্যাশিত নয়। চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থগুলি যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা নিজেরা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। এবং এই সব কাব্যের শ্রোতা এবং পাঠকেরাও নিত্যলীলা ও প্রকটলীলায় সম বিশ্বাসী ছিলেন। ভক্ত তাঁর হৃদয়ে মহাপ্রভুর যে মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন, কাব্যে তারই প্রকাশ ঘটেছে। তাই তাঁরা বলেন—

'অলৌকিক লীলা ইহা পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইবে তর্কে হয় বহুদূর ॥'

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তাই চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলিকে যথার্থ চরিতসাহিত্যের মর্যাদা দিতে চান নি। তাঁদের মতে এগুলি 'চরিত নয়—চরিতামৃত; চরিতের অংশ কম, অমৃতের অংশই বেশি।' আসলে চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলিতে অপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনা সম্পূর্ণ পরিহার করা সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া বিভিন্ন চরিতগ্রন্থে একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়—যা অনেক সময় পরস্পর বিরোধী। তবে বৈষ্ণবভক্তের কাছে চৈতন্যজীবনের প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত কোন ঘটনাই আপত্তিকর নয়।

ভগবানের লীলা বহু বিচিত্র—ঐহিক বিচারবুদ্ধি সেখানে সর্বদা প্রযোজ্য নয়। বৃন্দাবন দাসের রচনায় আমরা শুনি—

'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়।
কেহ কেহ ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥'

শ্রীচৈতন্যের নিত্যত্বে ও নিত্যলীলায় যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা ঐতিহাসিক ও পারমার্থিক সত্যকে নির্বিচারে গ্রহণ করেন। সেখানে বিশ্লেষণ নয়—আস্বাদনই কাব্য উপভোগের প্রধান উপায়।

মহাপ্রভুর জীবনকাহিনী রচনার প্রথম প্রয়াস দেখা গেছে মুরারি গুপ্তের সংস্কৃতে

লেখা চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে। পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূরের চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থটিরও নাম—চৈতন্যচরিতামৃত। এই প্রসঙ্গে কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকা কাব্যের কথাও উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়া অধুনালুপ্ত বঙ্গদেশীয় বিপ্রের রচনা বা কিছু বাংলা ও সংস্কৃতে লেখা কবিতা ও গানের মধ্যে মহাপ্রভুর জীবনের বর্ণনা পাই।

বাংলায় চৈতন্যজীবনী রচনার পথিকৃৎ বৃন্দাবন দাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়—

'কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥'

নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসাহে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যজীবনী রচনা করেন। নিত্যানন্দের কাছ থেকেই তিনি অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। তবে ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁর নিজস্ব। স্বতঃস্ফূর্ত রচনার নিদর্শন হিসাবে চৈতন্যভাগবত অসামান্যতা দাবি করতে পারে। অকৃত্রিম ভক্তিউদ্বেল হৃদয়ের প্রকাশে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কবিরা চৈতন্যজীবনী রচনাকালে বৃন্দাবন দাসের কাব্য থেকে শুধু তথ্য সংগ্রহ করেন নি, সেই সঙ্গে ভাবপ্রেরণাও লাভ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃতজ্ঞচিত্তে জানিয়েছেন—

'বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস
তাঁর কৃপা বিন অন্যে না হয় প্রকাশ।'

সমসাময়িক সামাজিক-ঐতিহাসিক চিত্র হিসাবে চৈতন্যভাগবত আধুনিক পাঠকের কাছেও মূল্যবান গ্রন্থ বলে পরিগণিত হয়। মানবরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৃন্দাবন দাস বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। উদ্ধত নিমাই পণ্ডিতের চিত্রাঙ্কনে বা গৃহত্যাগ করার সময় মাতার প্রতি সম্ভাষণে মহাপ্রভুর চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত এবং সার্থক হয়ে উঠেছে। যেমন—

'বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বার বার
তোমার সকল ভার আমার আমার॥'

চৈতন্যভাগবত তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। মহাপ্রভুর জন্ম থেকে শুরু করে সন্ন্যাসের পর নীলাচলভ্রমণ পর্যন্ত ঘটনাবলী কাব্যটিতে বিবৃত হয়েছে। আদি খণ্ডে সূত্রাকারে সেতুবন্ধ ও মথুরাগমনের উল্লেখ থাকলেও মহাপ্রভুর শেষজীবন সম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ কাব্যমধ্যে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাস এই জন্যই জানিয়েছেন 'চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ।' অনেকে এইজন্য বৃন্দাবনদাসের কাব্যটিকে অসমাপ্ত মনে করেছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের কাব্য-পরিকল্পনা বিচার করলে মনে হয়—মহাপ্রভুর আদি ও মধ্যলীলা বর্ণনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষতঃ

নিত্যানন্দের মহিমাকীর্তনের সঙ্গে চৈতন্যজীবনের যে অংশটি যুক্ত—সেইটুকু বর্ণনাই বৃন্দাবন দাস সবিস্তারে করেছেন।

আধুনিককালে বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্যভাগবতের তথ্যগত অসংগতি এবং সেইজন্য জীবনীকাব্য হিসাবে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলেছেন। নিত্যানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে শ্রীচৈতন্যের আচরণে যে উদারতা দেখা দিয়েছে—তা অন্য কোন কবির রচনায় দেখা যায় না। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের অভিন্নতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন দাস ভাগবতলীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে অলৌকিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। ক্রমভঙ্গ দোষও চৈতন্যভাগবতে বিশেষভাবে দেখা যায়। আসলে ঐতিহাসিক পারম্পর্য বা ক্রম রক্ষা করার দিকে বৃন্দাবন দাসের লক্ষ্য ছিল না। তা ছাড়া পৌরাণিক রীতি অবলম্বনে যম-চিত্রগুপ্ত সংবাদের মত অলৌকিক ঘটনাবলী বাস্তব জীবনকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এসব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আধুনিক সমালোচকেরা চৈতন্যভাগবতের অসামান্য মূল্য স্বীকার করেন।

'বৃন্দাবন দাস সহজ ভক্তির আলোকে দেখিয়াছেন বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার কাব্যে অলৌকিকতার অবসর আসিয়াছে। ঐ অলৌকিকতা নির্বিচার—অনেকাংশে ভক্তহৃদয়ের ভাবনাজাত।' ('মধ্যযুগের কবি ও কাব্য') আসলে—

'মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।'

লোচন দাস যখন চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন তখন তিনি জীবনীকাব্যের একটি স্বতন্ত্র আদর্শ গ্রহণ করেছেন। আসলে লোচন দাস মঙ্গলকাব্যের আধারে 'গৌরপারম্যবাদ' পরিবেশন করেছেন। সম্প্রদায় বিশেষের কাছে তাঁর কাব্য অসামান্য মূল্যবান বলে পরিগণিত হলেও বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তত্ত্বগত কারণেই কাব্যটি গ্রহণ করেননি। দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায়—লোচনদাসের কাব্যটি 'ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাঁটি কল্পনার দ্রব্য।' জয়ানন্দও তাঁর কাব্যটিকে চৈতন্যমঙ্গল নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণবীয় রীতি বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি। জয়ানন্দ লিখেছেন একটি পাঁচালী কাব্য। তার মধ্যে কিছু নতুন তথ্য আছে বটে এবং ঐতিহাসিকতা গুণের জন্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর প্রশংসা করেছেন সত্য—কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা জয়ানন্দের কাব্যে দেখেছেন পৌরাণিক কাহিনীর বিকৃত ব্যাখ্যা এবং মহাপ্রভুর মুখে অপ্রত্যাশিত বৈরাগ্যের উপদেশ। সম্ভবত এই জন্যই জয়ানন্দের কাব্যটি যথেষ্ট প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি।

তুলনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। সুলিখিত গ্রন্থ হিসাবেও বটে, প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে ততোধিক। চৈতন্যচরিতামৃত 'নিঃসন্দেহে আধুনিক পূর্ব বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ

রচনা।' তথ্যগত ভ্রান্তি সম্পূর্ণ পরিহার করা কৃষ্ণদাসের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। অলৌকিক ঘটনাও তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চৈতন্যচরিতামৃতের মূল্য কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। তার কারণ চৈতন্যের সমগ্র জীবন একমাত্র কৃষ্ণদাসই বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি যেখানে অসম্পূর্ণ, সেখানে চৈতন্যচরিতামৃত পূর্ণাঙ্গ চরিতরচনার নিদর্শন। তথ্যসংগ্রহেও কৃষ্ণদাস অত্যন্ত তৎপর এবং নিষ্ঠাবান। ঘটনা বর্ণনাকালে তিনি সর্বত্র উৎস নির্দেশ করেন। সর্বোপরি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ জীবনের ভাব আস্বাদনের আলেখ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ এমন সুন্দরভাবে এঁকেছেন যে তাতে আধ্যাত্মিক সাধনায় যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের যে মূর্তি আমাদের মানসপটে অঙ্কিত রয়েছে তাতে রেখাসম্পাত করেছেন রূপ, রঘুনাথ, মুরারী, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি ; কিন্তু বর্ণবিন্যাস করে তাকে ভাস্বর ও জীবন্ত করে তুলেছেন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও জীবনলীলা শুধু বাঙলার নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। পৃথিবীতে সংঘটিত আর কোন ঘটনাই জাতীয় জীবনে এত সুদূরপ্রসারী ও বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। চৈতন্যধর্মের ভাবপুষ্ট বাঙালী জাতি যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার জীবনযাত্রায় তাহার কর্মে ও মনন-চিন্তনে, তাহার কাব্যসাহিত্যে, তাহার সমাজ-আদর্শ-সংগঠনে ইহার প্রভাব অক্ষয় হইয়া আছে। পৃথিবীর কোন এক ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া এত ভক্তির উচ্ছ্বাস, এত ভালবাসার আত্মীয়তাবোধ, দেবত্বের এত নিকট স্পর্শ, অন্তরের এত আলোড়ন, কবিত্বের এত অফুরন্ত নির্ঝর ; অলংকার, দর্শন ও বিধি-রচনার এমন আশ্চর্য মননশক্তি, ধর্মচেতনার এত প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানের এমন আন্তরিক সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

(বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈতন্যচরিতগ্রন্থ

চৈতন্যদেবের চরিতগ্রন্থসমূহেও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের সামাজিক জীবনের নির্ভরযোগ্য বিবরণ মিলে।···মোটের উপর তৎকালীন সমাজের রীতি-নীতি, চাল-চলন, রুচি-আদর্শ, সাধারণ লোকের দৈনিক জীবনযাত্রা, তীর্থপর্যটন, ধর্মবিষয়ক বিচার বিতর্ক, প্রভৃতি বিষয়ের যে বিবরণ এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সংকলন করা যায়, তাহা বাস্তবের সত্য প্রতিচ্ছবি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কেবল যে আমাদের ধর্মজীবনের নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়াছে তাহা নহে, আমাদের ঐতিহাসিক বোধকেও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।···তাঁহার ভাবসমৃদ্ধ জীবন সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের প্রবল আগ্রহ অসংখ্য ভক্তকে মহাকাব্য, কড়চা, জীবনচরিত, নাটক, ধর্মব্যাখ্যা, প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ রচনার প্রণোদিত করিয়াছে—সাহিত্যের মরাখাতে একটি কুলপ্লাবী জোয়ার আনিয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থে যে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার খাঁটি আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে তাহা নহে।···তথাপি এই ধর্মোন্মাদের প্রভাবে একটা ঐতিহাসিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী, প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট সংবাদসংগ্রহ ও যথাশক্তি তাহার সত্যতা যাচাই করিয়া ভবিষ্যৎকালের জন্য লিপিবদ্ধ করিবার

আগ্রহপূর্ণ প্রবণতা, সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী ভক্ত ও অনুচরবর্গ নবদ্বীপ হইতে পুরী ও বৃন্দাবন অবিরত গমনাগমনের দ্বারা যে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই পথে ধ্যানমগ্ন ভক্তিবিহ্বলতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি তথ্যানুসন্ধিৎসা হাত ধরিয়া পাশাপাশি যাত্রা করিয়াছে।

(বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীচৈতন্যধর্ম

বাঙলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ কোন্‌টি ইহা নির্দেশ করিতে হইলে চৈতন্যযুগকেই সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মানুষের আত্মিক বিশুদ্ধি, মানবিক সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ মাধুর্যবিকাশ, মানব-সমাজের উদার ভাব-সংহতি ও সাম্যবোধ এই যুগে যেরূপ অভাবনীয় অগ্রগতির নিদর্শন দেখাইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই যুগে মানুষের ঐশী উপলব্ধি যত উজ্জ্বল ও সর্বব্যাপী হইয়াছিল, তাহা অন্য যুগের তুলনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু ধর্মচেতনায় নহে, কাব্যে, দর্শন-অলংকারে, জীবনীরচনায় সাহিত্যিক উৎকর্ষের এরূপ বহুমুখী ও অসাধারণ বিকাশ কোনও একটি যুগে কেন্দ্রীভূত দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের মর্যাদা-স্বীকৃতি, সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতি মমতাবোধ, সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সামাজিক সহৃদয়তা ও সমপ্রাণতা, সমাজের সর্বস্তরে উচ্চ, কোমল ও আদর্শনিষ্ঠ মনোভাবের ব্যাপক বিস্তার—এই যুগটিকে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্তরূপে চিহ্নিত করিয়াছে।

জাতীয় জীবনের এই সর্বতোমুখী স্ফূরণ ও অভ্যুদয়ের কেন্দ্রশক্তি ছিলেন··· শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁহারই মাধ্যমে স্বর্গের দিব্যদ্যুতি মর্ত্যলোকের প্রাত্যহিক সূর্যালোকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।···অলৌকিক রহস্যানুভূতি মানবিক দেহমনের চক্ষুঃসীমার মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল।···মনুষ্যদেহে, মানবিক বৃত্তির অনুশীলনে, মানব-সমাজ ও জীবনযাত্রার পটভূমিকায় ঐশী লীলারহস্যের যতটুকু আস্বাদন সম্ভব, চৈতন্যদেবের জীবনে তাহা পূর্ণমাত্রায় সাধিত হইয়াছে। মানবজীবনের দৈবায়নের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা শ্রীচৈতন্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ও তাঁহার দিব্যচেতনা-বিচ্ছুরিত আলোকশিখা সমস্ত যুগজীবনকে এক অপার্থিব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

(সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্য-সাধনা

বৈষ্ণব জগতে কৃষ্ণদাসের অমর গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা অবিমিশ্র কবিত্বশক্তির উৎকর্ষের জন্য নহে। সরল ও মর্মস্পর্শী বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস ও লোচন দাস নিতান্ত উপেক্ষণীয় প্রতিযোগী নহেন; এমন কি বহু স্থানে তাঁহাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হয়। কৃষ্ণদাস কেবল কবিত্বশক্তির অনুশীলনের ক্ষেত্রস্বরূপ চৈতন্যদেবের জীবনের উপাদানকে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে যে কাব্য-সৌন্দর্য আছে, তাহা গৌণ ও মনে হয় যে, লেখকের অনভিপ্রেত। ভক্তিরস, বিবেক ও বিনয়ের অবতার কবি, নিজ বিষয়-গৌরবের মাহাত্ম্যে এত অভিভূত যে সচেতন সৌন্দর্য সৃষ্টির শিল্পী মনোভাব তাঁহার মধ্যে প্রায় অলক্ষ্য বলিলেই হয়। কাব্য-রচনা বিষয়ে তিনি যেন এক রহস্যময় দৈবশক্তির অর্ধ-অচেতন বাহন মাত্র। চৈতন্যদেবের লোকোত্তর মহিমা যেন তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।...

তাহা হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৈশিষ্ট্যের মূলসূত্র কোথায়? আমার মনে হয় যে, তাঁহার বৈশিষ্ট্য দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যদেবের লোকোত্তব চরিত্রটি সর্বপ্রথম এক রসঘন ভাবসংহতির রূপ ধারণ করিয়াছে—তাঁহার নানা অলৌকিক ঘটনার মধ্যে কৃষ্ণদাস একটি কলাগত সুষমা ও ভাব-সমগ্রতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে চৈতন্য-জীবনী এক স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্ব-বিরোধশূন্য দার্শনিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিধৃত হইয়াছে।...

চৈতন্যজীবনের ঘটনাবলী অনাবিল ও অজস্র ভক্তিবস-বিধৌত হইয়া, নানা ভক্তের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাক্ষ্যে, সুসংবদ্ধ ধর্মমতের কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রণে, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তবাতিসারী তাৎপর্য-বিশ্লেষণে ধীরে ধীরে এক নূতন অধ্যাত্ম সত্তার ভাব-উপাদানে রূপান্তরিত হইতেছিল। যাহা লৌকিক...যাহা বহির্মুখী, যাহা স্থান-কালে সীমাবদ্ধ তাহা ভক্তের চোখে, কবির সৌন্দর্যানুভূতিতে ও দার্শনিকের শাশ্বত সত্যানুসন্ধিৎসার মধ্যে এক নূতন ভাব-ব্যঞ্জনার কিরণসম্পাতে ভাস্বর হইয়া চিরন্তন রস ও রহস্যলোকের সূক্ষ্ম, সুকুমার পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে। তথ্যের এই সুকুমার রূপান্তরটাই কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়।

...চৈতন্যদেবের... শেষ কয়েকটি বৎসরের লীলার মধ্যেই তাঁহার জীবনের পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিহিত আছে। তাঁহার পূর্বজীবনের সমস্ত ভাবৈশ্বর্য এই চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুতিমাত্র। তাঁহার অজস্র-প্রবাহিত ভাবধারার শাখা-নদীসমূহ নীলাচল-প্রান্তবর্তী মহাসমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিলীন হইয়াছে। কৃষ্ণদাস

কবিরাজের অঙ্কিত চিত্রেই শ্রীচৈতন্যের দেবকান্তি পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনিই সহস্র সহস্র বৈষ্ণব ভক্তের মনে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার কারুণ্যসিক্ত অলৌকিক মহিমাটি অবিস্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের…বৈশিষ্ট্য হইল দার্শনিকতার সহিত কাব্যের বিচিত্র সমন্বয়। তাঁহার রচনায় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের অতি নিগূঢ় দার্শনিক আলোচনা কাব্যরসমণ্ডিত হইয়া একাধারে জ্ঞান, ভক্তি ও সৌন্দর্য-পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটাইয়াছে। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের দার্শনিক পটভূমিতে সন্নিবেশ ভারতীয় ধর্মসাধনার সনাতন বৈশিষ্ট্য। এই রূপান্তর-সাধন প্রধানতঃ রূপ, সনাতন, জীব ও অন্যান্য বৃন্দাবনবাসী গোস্বামী-গোষ্ঠীর প্রভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। একদিকে যখন বাঙলা দেশ চৈতন্যপ্রেমে মাতোয়ারা, তাহার আকাশ-বাতাস কীর্তনের রোলে মুখরিত ও পদাবলী-সাহিত্যের মাধুর্যরসে অভিসিঞ্চিত, তখন অন্যদিকে বৃন্দাবনের নির্জন সাধনাতীর্থে গোস্বামীবৃন্দ এই…নবজাত ধর্মের ও সাহিত্যের অলংকারশাস্ত্র ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি রচনায় প্রশান্ত নিষ্ঠার সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কোন ধর্মকে ধর্মোচিত মর্যাদা দিতে হইলে শুধু তাহার কর্মনিষ্ঠা ও হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; তাহাকে দার্শনিক যুক্তিবাদের অপরিবর্তনীয় আশ্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উপনিষদ ও গীতার সমপর্যায়ভুক্ত করিতে হইবে।…কবিরাজ গোস্বামী…বৈষ্ণব ধর্মকে ভক্তিবিলাস ও রসোপভোগের উপকরণ হইতে শাশ্বত জ্ঞানের বিষয়ে উন্নীত করিয়া ইহার স্থায়িত্বের কাল ও প্রভাবের পরিধি বাড়াইয়া দিয়াছেন; কর্ম ও ভক্তির…উপর জ্ঞানের শান্ত চিরন্তনতার আরোপ করিয়াছেন।…অপ্রমত্ত জ্ঞান ও যুক্তিবাদের পরীক্ষায় যে ধর্ম উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা মহাকালের নিকট চিরস্থায়িত্বের অধিকার লইয়া আসিয়াছে। ইহাই বৈষ্ণব সাহিত্যে ও ধর্মে কবিরাজ গোস্বামীর অনন্যসাধারণ অবদান।

এ হেন মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি আমরা কেমন করিয়া উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করিব? তিনি শুধু কবি নন যে, কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার মহিমার পরিমাপ করিব। তিনি শুধু দার্শনিক নন যে, তাঁহার মতবাদের মৌলিকতা ও যুক্তিনৈপুণ্যের মানদণ্ডে তাঁহার উৎকর্ষ নির্ণীত হইবে। তিনি একজন সাধক ও ভক্ত; নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতি, নিগূঢ় সাধনা ও ভক্তিই তাঁহার কাব্যরচনার মূল প্রেরণা। আমরা নিজ নিজ রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁহার সর্বাঙ্গীণ মানস-ঐশ্বর্যের অংশমাত্র আস্বাদনের অধিকারী।…

কবির কাব্যে তাহার যেটুকু পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সম্পূর্ণ করিতে গেলে তাঁহার কাল ও স্থান প্রতিবেশের প্রভাবটি মনে মনে কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। কবি এই প্রতিবেশ হইতে রস আহরণ করেন; যুগের চিন্তাধারা, আদর্শ-

স্বপ্ন, কর্মানুষ্ঠান তাঁহার দেহমনকে সহস্র বন্ধনে সমসাময়িক জীবনযাত্রার সহিত জড়াইয়া ধরে।…কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্মৃতিরক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার জন্য কিছু করা নয়, ইহা তাঁহার প্রভাব-স্বীকারের জন্য আমাদেরই চিত্ত-বিশুদ্ধির আয়োজন। …জানিনা, ঝামটপুরের শূন্য প্রান্তরে তাঁহার স্মৃতি-বিজড়িত যে ধূলিরেণু বাতাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার মধ্যে অতীতের সেই বিস্মৃত সুরটি, তাঁহার সাধক জীবনের সেই নিগূঢ় মন্ত্র রহস্যটি খুঁজিয়া পাইব কিনা।

(সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়